মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.)

কালেমা তাইয়্যেবা

কালেমা তাইয়্যেবা

আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপক প্রসার ও প্রচারের জন্য বর্তমান মুদ্রণ থেকে লেখকের বাক্যের গঠন প্রণালী ঠিক রেখে সাধু রীতিতে সামান্য পরিবর্তন করে চলতি ভাষায় প্রকাশ করা হলো।

—প্রকাশক

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা –১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৭১২-১৮৫০০০

কালেমা তাইয়্যেবা
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রথম প্রকাশ ঃ
প্রথম ঃ ১৯৫০ ইং
৪০ তম প্রকাশ
জানুয়ারী ঃ ২০১০ ইংরেজী
সফর ঃ ১৪৩১ হিজরী
মাঘ ঃ ১৪১৬ বাংলা

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
খায়রুন প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা জহিরুল হক
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ঃ
মাল্টি লিংক

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস, ২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ
সাদা ঃ ৩০.০০ টাকা
বোর্ড বাধাঁই ঃ ৪০.০০ টাকা
ইংরেজী ঃ ৫০.০০ টাকা

ISBN : 984-8455-00-0

ভূমিকা

কুরআন, হাদীস, ইসলাম ও মুসলিম জাতির ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর রচিত অসংখ্য ইসলামী গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া ইসলামের মূলমন্ত্র 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা'র অর্থ এবং যে তাৎপর্য আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই এই পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করিয়া পাঠকদের সমীপে পেশ করিলাম। কালেমার অর্থ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখিতে গিয়া এই পুস্তিকায় যাহা বিবৃত হইয়াছে, বলা বাহুল্য, আমার ঈমান— আমার মন ও মগজের স্থির বিশ্বাসেই তাহা লিখিয়াছি। আমি একান্তভাবে মনে করি যে, কালেমা তাইয়্যেবার অন্তত এইটুকু ব্যাপক ও বিস্তারিত অর্থ জানিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস স্থাপন না করিলে ইসলামের এই মূলমন্ত্রকে জানা হয় না এবং তাহা পূর্ণরূপে বিশ্বাসও করা যায় না। উপরন্তু এই কালেমা অনুযায়ী আমাদের বাস্তব কর্মজীবনকে গঠন করাও সম্ভব হইতে পারে না। এই জন্যই সর্বসাধারণ মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিষয়টি যথাসম্ভব সহজ ভাষায় এবং সহজ কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

বর্তমান কালের মুসলমানরা এই কালেমাকে অন্তত এতটুকু খোলাখুলি ও ব্যাপকভাবে জানিয়া-বুঝিয়া বিশ্বাস করুক এবং প্রথম যুগের মুসলমানদের ন্যায় ইহা হইতে তেমনি বিরাট বিপ্লবী শক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীতে আবার দুর্জয় হইয়া উঠুক, ইহাই আমার অন্তরের ঐকান্তিক কামনা। ১৯৫০ সনে এই পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বিগত বৎসরগুলিতে ইহার বহু সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সমাজে এই পুস্তিকা সমাদৃত হইয়াছে দেখিয়া আমি আল্লাহ্ তা'আলার লাখ লাখ শোকর আদায় করিতেছি।

একটি প্রয়োজনীয় কথা এখানে বলিয়া রাখি। ভুল ও ভ্রান্তিতে গড়া মানুষ। কালে-মার বিস্তারিত অর্থ লিখিতে গিয়া আমি কোথাও ভুল করিয়া থাকিতে পারি; তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। চিন্তাশীল পাঠকগণ যদি আমার ভুল আমাকেই ধরাইয়া দেন, তবেই আমার প্রতি সুবিচার করা হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, নিছক কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতেই কালেমার এই ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে; তাই ইহার ভুলও একমাত্র কুরআন ও হাদীস হইতেই প্রমাণ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত সত্য-মিথ্যা বা ভুল-নির্ভুল নির্ধারণের জন্য অন্য কোন মানদণ্ড আমি স্বীকার করি না।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

১-জুন ১৯৮৭

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ- تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا -

(ابراهيم -٢٤-٢٥)

তুমি কি লক্ষ্য করোনি আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছেন ? কালেমা তাইয়্যেবা একটি পবিত্র বলিষ্ঠ উত্তম বৃক্ষ যেন। এর মূল (মাটির) গভীরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং এর শাখা-প্রশাখা মহাশূন্যে (বিস্তীর্ণ)। এটি সব সময় তার আল্লাহ্— মালিকের অনুমতিক্রমে স্বীয় ফল প্রদান করতে থাকে। (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪ ও ২৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কালেমা তাইয়্যেবা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

শুরু কথা

কালেমা তাইয়্যেবা ইসলামের মূল ঘোষণা। এই কালেমা না পড়ে কোনো মানুষই ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। এ জন্যই কোনো কাফের অথবা মুশরিক ব্যক্তি যখন ইসলাম কবুল করতে চায়, তখন সর্বপ্রথমই তাকে এই কালেমা পড়তে হয়। মুসলমানদের ঘরে কোনো সন্তানের জন্ম হলে তার কানে সর্বপ্রথম এই কালেমার আওয়াজ শোনানো হয়। মুসলমানদের মহল্লায় মহল্লায় দিন-রাতের মধ্যে পাঁচ বার মুয়াজ্জিন এই কালেমা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে সকলকে নামাযের দিকে আহ্‌বান জানায়। নামাযের মধ্যে এই কালেমা বারবার পড়তে হয়। কুরআন শরীফের পাতায় পাতায় এই কালেমার কথা নানাভাবে লেখা আছে। ইসলামে কালেমার গুরুত্ব যে কতখানি, এর দ্বারাই তা বুঝতে পারা যায়। অতএব প্রত্যেকটি মুসলমানের পক্ষেই এই কালেমার অর্থ খুব ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার।

বীজ বপন না করলে যেমন গাছ হতে পারে না, তেমনি এই কালেমা মানুষের হৃদয়-মনে ভালো করে শিকড় গাড়তে না পারলে মানুষের জীবন-ক্ষেতে ইসলামের গাছ কিছুতেই জন্মিতে পারে না। বীজ বপন করলেই গাছ হয় এবং সেই গাছের যেমন কাণ্ড, ডাল-পালা এবং ফুল ও ফল হয়ে থাকে, তেমনি মুসলমানগণ এই কালেমার অর্থ খুব ভালো করে বুঝে-শুনে তা মনে-প্রাণে গ্রহণ না করলে ইসলামের এই নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায় করা, হারাম-হালাল বেছে চলা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপারে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লক্ষ্য করে কাজ করা— প্রভৃতি গুণাবলী মুসলমানদের জীবনে কিছুতেই ফুটে উঠতে পারে না।

বীজ যদি খারাপ হয়, তবে তা থেকে গাছ অঙ্কুরিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে মানুষ যদি এই কালেমাকে বুঝে-শুনে কবুল না করে, কিংবা এর কোনো ভুল অর্থ গ্রহণ করে, তবে তার জীবনে ইসলামের হুকুম-আহকাম পালন করে চলা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

আপনি যদি অন্য কারোর সহিত কোনো কারবার করেন— তা যে কারবারই হোক না কেন— তবে প্রথমেই আপনাকে তার সহিত একটা কথা পাকাপাকিভাবে ঠিক করে নিতে হয়; নয়তো আপনার কাজ ভালো করে চলতে পারে না। আপনি যদি কাউকেও কোনো টাকা-পয়সা ধার দেন, তবে প্রথমে আপনি তার দ্বারা এ কথা স্বীকার করিয়ে নেন যে, টাকা নিয়ে সে ঠিক সময়মতো পরিশোধ করবে এবং অমুক তারিখের মধ্যে পরিশোধ করে দেবে। সর্বোপরি, টাকা নিয়ে তা সে কখনো অস্বীকার করবে না ইত্যাদি। এ সব কথা সে যদি স্বীকার করে তবেই আপনি তাকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন; নতুবা আপনি কিছুতেই কাউকেও এক পয়সা ধার দেন না।

আপনি যদি আপনার জমি কাউকে চাষ করতে দেন, তবে তার সঙ্গেও আপনার দরকারী বন্দোবস্ত আগেই করে নিতে হয়। আপনি নিজে যদি কারো জমি চাষাবাদ বা ভোগ-ব্যবহার করতে চান, তবে আপনাকে জমির মালিকের শর্ত স্বীকার করে 'কবুলিয়ত-নামা' লিখে দিতে হয়। ঠিক এরূপই, মুসলমানকে সমস্ত জীবনব্যাপী যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কারবার করতে হয়, এই কালেমা পড়ে সেই আল্লাহ্‌র সঙ্গেই জীবনের সমস্ত কাজের বিষয়ে কথাবার্তা পাকা করে নেওয়া হয়। দলিলে কি লেখা হয়েছে, তা না জেনেই যদি আপনি তাতে দস্তখত করে দেন, তবে সে দলিলের শর্ত অনুসারে আপনি কিছুতেই কাজ করতে পারবেন না। কারণ, দলিলের কোন কোন শর্ত স্বীকার করে আপনি দস্তখত করেছেন, তা আপনি জানেন না। ফলে আপনার কাজকর্ম সেই দলিলের শর্তের বিরুদ্ধে যেতে পারে। এরূপেই, আপনি কালেমা তাইয়্যেবা পড়ে ইসলামের সীমার মধ্যে এলেন, নিজেকে মুসলমান ও 'আল্লাহ্‌র দাস' বলে মনে করলেন; কিন্তু আপনি জানলেন না যে, এই কালেমা পড়ে আপনি কোন কোন কাজ করবেন বলে স্বীকার করেছেন আর কোন কোন কাজ করবেন না বলে ওয়াদা করেছেন। এরূপ না হলে আপনার কালেমা পাঠ করার কোনোই মূল্য থাকে না। আপনার এই কালেমা পড়া আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হতে পারে না। আপনি প্রকৃত 'মুসলমান' ও 'আল্লাহ্‌র বান্দাহ্' হতে পারেন না। আপনার জীবনের কোনো কাজই সেই কালেমা অনুসারে সমাধা হতে পারে না।

বস্তুত এ কালেমাটি সর্বদিক দিয়ে অত্যন্ত বিরাট ও মহান। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এ কালেমার সাক্ষ্য ঘোষণা করেছেন; এর সত্যতা স্বীকার করেছেন সমস্ত ফেরেশতা এবং সৃষ্টিকুলের মধ্যেকার সমস্ত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ। এ অতীব সত্য ও সঠিক ঘোষণা, ইনসাফ ও ন্যায়পরতার অকাট্য প্রতীক। এই কালেমা দ্বারা যা ঘোষণা করা হয়, তাই সত্য ও যথার্থ, প্রকৃত অবস্থার সহিত পুরোপুরি সামস্যশীল। এটি ইসলামের মূল ঘোষণা। এ কালেমার প্রকৃত মর্মবাণী না জানলে,

পরম সত্য বলে অন্তর দিয়ে তা মেনে না নিলে, মুখে স্পষ্টভাবে এর সত্যতা ঘোষণা না করলে এবং একে পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে অন্তর দিয়ে রাজি না হলে কেউই মুসলিম হতে পারে না।

এই কালেমা 'তওহীদী আকীদা'র বলিষ্ঠ ঘোষণা এবং 'শির্কী আকীদা' সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ও অমান্য করার ঘোষণা। এ ঘোষণা দ্বারাই একজন মুসলমান শির্কী আকীদার জঞ্জাল ও দুঃখময় পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এ থেকে পুরোপুরি ফায়দা পেতে হলে সাতটি শর্ত পূরণ করতে হবে। **প্রথমত**, জ্ঞান— এর দ্বারা কি অস্বীকার করা হলো এবং কি স্বীকার করা হলো তা জানা। **দ্বিতীয়ত**, যা জানা গেল তা মনে-প্রাণে দৃঢ়রূপে সত্য বলে বিশ্বাস করা; তাতে একবিন্দু সন্দেহ পোষণ না করা। **তৃতীয়ত**, এর প্রতি পরম নিষ্ঠা বোধ করা— শির্কের বিরুদ্ধে কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব রাখা। **চতুর্থত**, এমন সত্যতা সহকারে এর ঘোষণা দেওয়া যেন তাতে মুনাফিকীর লেশমাত্র না থাকে। **পঞ্চমত**, এ কালেমা'র প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা ও মনের দরদ পোষণ করা— সেজন্য অন্তরে আনন্দ অনুভব করা। **ষষ্ঠত**, এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করা। এর দাবি পূরণে প্রস্তুত হওয়া। যে সব কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠা প্রমাণিত হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়া যায় তা করতে রাজি হওয়া এবং **সপ্তমত**, এর বিপরীত সব কিছুকেই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতে মনে-প্রাণে প্রস্তুত হওয়া।

এখন আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে, কালেমা তাইয়্যেবা না পড়ে যেমন কেউ ইসলামের সীমার মধ্যে আসতে পারে না, ঠিক তেমনি এর অর্থ না জেনে, এ শুধু মুখে মুখে উচ্চারণ করেই কেউ খাঁটি মুসলমান হতে এবং মুসলমানের মতো কাজ করতে পারে না। বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান যে ইসলামের হুকুম-আহকাম পালন করে না— 'মুসলমান' হয়েও যে তারা অমুসলমানের মতো কাজ-কর্ম ও আচরণ করে এর একমাত্র কারণ এই যে, তারা কালেমা পড়ে এবং বিশ্বাসও করে বটে, কিন্তু জানে না যে, তারা কি পড়ে আর কি বিশ্বাস করে। এর ফলে দেখছি, কোটি কোটি মুসলমান দুনিয়ায় বাস করে অথচ ইসলাম পালন করে প্রকৃত মুসলমানের মতো অধিকাংশই জীবন যাপন করে না; বরং দেখা যাচ্ছে যে, তারা প্রতিটি পদে পদে ইসলামের খেলাফ কাজ করে। এ অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে ?

কালেমা পড়ে এর অর্থ বুঝি না বলে যেমন আমরা খাঁটি মুসলমানের ন্যায় কাজ করতে পারি না, ঠিক তেমনি এ কারণেই আমরা আল্লাহ্‌র রহমতও লাভ করতে পারছি না। ফলে আমরা নানা প্রকার দুঃখ ও মুসীবতে পড়ে গেছি— অধঃপতনের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছি।

কাজেই এখন যদি আমরা আবার প্রকৃত মুসলমান হতে চাই, দুনিয়ার বুকে যদি আমরা আবার আল্লাহ্‌র রহমত পেয়ে উন্নতি করতে ইচ্ছা করি এবং পরকালেও যদি আমরা সত্যিকার মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাজির হতে ইচ্ছা করি, তা হলে এই কালেমা তাইয়্যেবার অর্থ আমাদের ভালো করে জেনে ও বুঝে নিতে হবে এবং ধীরে ধীরে তদানুযায়ী নিজেদের জীবনকে ঢেলে গঠন করতে হবে। তাই আমরা এখানে কালেমা তাইয়্যেবার বিস্তারিত অর্থ লিখতে চেষ্টা করছি।

কালেমা তাইয়্যেবার অর্থ

কালেমা তাইয়্যেবা কোনো লম্বা চওড়া জিনিস নয়, তা আপনারা সকলেই জানেন :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ–

'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই— হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল।

এই কালেমার দুইটি অংশঃ

প্রথম অংশ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

দ্বিতীয় অংশ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রথম অংশের অর্থ ঃ 'নেই (কোনো) মা'বুদ— আল্লাহ্ ছাড়া।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোনো মা'বুদ বা প্রভু নেই, যার গোলামী বা দাসত্ব করা যেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র মা'বুদ, প্রভু ও মালিক এবং ভয় করা ও মেনে চলার যোগ্য। তিনি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা— আমরা তাঁর সৃষ্টি। তিনি সকলের প্রভু— আমরা তাঁর অধীন দাস। তিনি সারা জাহানের মনিব এবং আমাদেরও মালিক। ভয় একমাত্র তাকেই করতে হবে। তিনিই একমাত্র উপাস্য। আমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব স্বীকার করি, কেবল তাঁরই আনুগত্য করি এবং কেবল তাঁরই আইন মেনে চলি।

আর দ্বিতীয় অংশের অর্থ ঃ মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁর আদর্শের প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতারূপে মানব জাতির নেতা ও পথ-প্রদর্শকরূপে পাঠিয়েছেন।

আগেই বলেছি, এই কালেমাই হলো ইসলামের মূল বুনিয়েদ। এর ওপর ইসলামের অন্যান্য বহু হুকুম-আহকামের বিরাট 'ইমারত' দাঁড়িয়ে থাকে। এটি না হলে সে 'ইমারত' এক মুহূর্তের তরেও তৈরি হতে পারে না— দাঁড়াতেও

পারে না। এই কালেমার মধ্যে আল্লাহ্‌র যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, ইসলামে তাই আল্লাহ্‌র সঠিক পরিচয়। এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য যে সত্তার মধ্যে বর্তমান, ইসলামে তাকেই 'আল্লাহ্' বলে স্বীকার করা হয়েছে। আবার ঐ সমস্ত গুণ একত্রে যার মধ্যে বর্তমান নেই, সে কখনো 'আল্লাহ্' হতে পারে না; ইসলাম তাকে আল্লাহ্ বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

আর মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে এ কথাই ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিনি শুধু মুহাম্মাদ (স) নামে একজন মানুষই নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলও বটে এবং এ-ই হলো তাঁর আসল পরিচয়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌কে সঠিকভাবে মানতে হলে মুহাম্মাদ (স) নামক রাসূলকেও সঠিকরূপে ও পুরোপুরিভাবে মানতে হবে।

প্রথম অংশের ব্যাখ্যা

এ কালেমার প্রথম অংশকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হলো নেতিবাচক, অর্থাৎ কোনো মা'বুদ নেই— প্রভু বা সৃষ্টিকর্তাও কেউ নেই। আমি কাউকেও ভয় করি না, কারো কাছে নতি স্বীকার করি না, কারো আইন মানি না, কারো দয়া-অনুগ্রহ বা সাহায্য আমি চাই না, কাউকেও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী স্বীকার করি না। কারো ইবাদত-বন্দেগী করি না। এসব দিক দিয়ে যে-কেহ আমার ওপর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করতে চাইলে, আমি তাকেই অস্বীকার করি। সকলের প্রতি আমি বিদ্রোহী। কারো সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আর দ্বিতীয় অংশ হলো ইতিবাচক; অর্থাৎ এ সব দিক দিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌কেই আমি স্বীকার করি ও মানি।

একজন মানুষ যখনই এই কালেমা পড়ে, তখন সে এর মধ্য দিয়ে এ কথাই স্বীকার করে যে, এই দুনিয়া এবং এর সমস্ত জীব-জন্তু ও বস্তু-সামগ্রী— এসবের কোনোটিই সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনি; এর সবই সৃষ্টিকর্তারই সৃষ্টি এবং সে সৃষ্টিকর্তাও বহু নয়, মাত্র একজন। আর সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নয়। কুরআন মজীদেরই সুস্পষ্ট ঘোষণায় বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ -

তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশ-রাজ্য ও পৃথিবী এবং এ দু'এর মধ্যে যা কিছু আছে, তা সবই কালের ছয়টি ভাগে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা সাজদাহ্ ঃ ৪)

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -

তোমাদের মা'বুদ— তিনি একমাত্র মা'বুদ; তিনি ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নেই— তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৩)

আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেন নি বরং একে রীতিমতো পরিচালনা করা, প্রাণশক্তি ও দরকারী খাদ্য দিয়ে একে এবং এর সমস্ত জীব-জন্তুকে বঁচিয়ে রাখা ও লালন-পালন করা প্রভৃতি কাজও করেন। এ সব ব্যাপারেও তাঁর কেউ শরীক নেই— কেউ সাহায্যকারীও নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানের অধিবাসীদের পালনকর্তা, মালিক ও প্রভু (رب العلمين) । আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যকার সব জিনিসের, সব বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-দৌলতের একমাত্র মালিক তিনিই।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا-

দুনিয়ার সমস্ত জীবকে খাদ্য দান করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার।(হূদ ঃ ৬)

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ ج خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ -

তিনিই তোমাদের আল্লাহ্, (যাঁর মধ্যে উল্লিখিতরূপ গুণাবলী বর্তমান) তিনি ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নেই। তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা; অতএব কেবল তাঁরই দাসত্ব করো— বন্দেগী করো। তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ব্যাপারেই দায়িত্বশীল। (সূরা আন'আম ঃ ১০২)

উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে একথা পরিষ্কাররূপে প্রমাণ হয়ে গেল যে, সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন আর কেউ নয়। তিনি এক ও একক; সারা জাহানের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, রিযিকদাতা ও প্রভু একমাত্র তিনিই। অতএব সেই এক আল্লাহ্রই দাসত্ব কবুল করা, কেবল তাঁকেই মা'বুদ ও প্রভু বলে স্বীকার করা এবং অন্য কারো মধ্যে এসব গুণ আছে বলে মনে না করা সমস্ত মানুষের কর্তব্য। কালেমা তাইয়্যেবার এই হলো গোড়ার কথা। কালেমা তাইয়্যেবার বিস্তারিত অর্থ খোলাখুলিভাবে পাওয়া যায় কুরআন মজীদের নিম্নর আয়াত দুটিতে ঃ

ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ - ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ-

হে মানুষ! ভিন্ন ভিন্ন ও একাধিক মা'বুদ স্বীকার করা ভালো, না একজন প্রকৃত শক্তিমান এবং সকলের ওপর জয়ী মা'বুদ ভালো? জেনে রাখো, এক আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা আর যে মা'বুদ নামের জিনিসগুলোর ইবাদত ও বন্দেগী করো, তা কতকগুলো অর্থহীন নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সেই নামগুলোও তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা মিলিয়া রেখেছ— আল্লাহ্ সে সম্পর্কে কোনো যুক্তি প্রমাণই নাযিল করেন নাই। অথচ হুকুম দেওয়া ও আইন রচনা করার অধিকার ও ক্ষমতা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। তিনি সকলের প্রতি এ আদেশ করেছেন যে, কেবল আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করো না। এ একমাত্র সত্য ও মজবুত 'দ্বীন'— জীবন যাপনের নিখুঁত সুদৃঢ় ব্যবস্থা। কিন্তু অনেক মানুষই তা জানে না।

(সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯-৪০)

কুরআনের এ আয়াত দুটিতেই কালেমা তাইয়্যেবার অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এ আয়াত দুটির সারাংশকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমত ঃ আল্লাহ্‌র একত্ব। এক আল্লাহ্‌কে স্বীকার করায় মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেরই সুখ-শান্তি লাভ হওয়া সম্ভব। একাধিক খোদা স্বীকার করায় মানুষের জীবন নানাবিধ দুঃখ ও অশান্তিতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত ঃ মুশরিকগণ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যে সব দেব-দেবী ও মানুষ-প্রভুর পূজা, উপাসনা ও দাসত্ব করে, তা সর্বতোভাবে অমূলক ও ভিত্তিহীন; তা কতগুলো নামের সমষ্টি মাত্র। আসলে তাদের কোনোই অস্তিত্ব নেই আর সেসব নামও আল্লাহ্ তা'আলা রাখেননি— মুশরেকগণ নিজেরাই তা রেখেছেন। মানুষের ক্ষতি বা উপকার করবার একবিন্দু ক্ষমতা তাদের নেই। আর সেই ক্ষমতা না থাকলে কাউকেও ইবাদত বা বন্দেগীর যোগ্য বলে মেনে নেওয়া যায় না।

তৃতীয়ত ঃ মানুষের কর্মজীবনের জন্য আইন-বিধান রচনা করা— কোনো কিছুর আদেশ করা ও নিষেধ করার ক্ষমতা এবং অধিকার এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। যারা এক আল্লাহ্‌কে স্বীকার করবে, তারা সেই এক আল্লাহ্‌র দেওয়া আইন ও বিধান ছাড়া আর কিছুই মানতে পারবে না। তারা নিজেদের ব্যক্তি জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এবং তাদের ধন-সম্পদে ভোগ-ব্যবহার ও ব্যয়-বন্টনে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধি-বিধানই মেনে চলতে বাধ্য হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলাই সার্বভৌমত তথা সর্বোচ্চ ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক। এটি অন্য কাউকেও দেওয়া যেতে পারে না।

চতুর্থত ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই সকলেরই মা'বুদ; মানুষ কেবল তাঁরই দাস— তাঁরই বান্দা। মানুষ এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করতে পারে না— অন্য কারো পূজা-উপাসনাও (এবাদত-বন্দেগী) করতে পারে না।

পঞ্চমত ঃ এবং শেষ কথা এই যে, উল্লিখিত চারটি বুনিয়েদী আকীদার সমন্বয়ে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে জীবন বিধান রচনা করে দেওয়া হয়েছে তাই একমাত্র অক্ষয় ও মজবুত ব্যবস্থা। এ ছাড়া অন্য কোনো মতের ধর্ম বা নীতি কিংবা আদর্শ অথবা জীবন বিধান মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য ও চিরস্থায়ী হতে পারে না— তা শান্তি ও সুখেরও ধর্ম হতে পারে না। এর কোনো একটি কথাও যদি কেউ বদলাতে চেষ্টা করে, তবে সে এ ধর্মের প্রকাশ্য দুশমন। বলা বাহুল্য, সেই মজবুত ধর্ম হলো একমাত্র ইসলাম।

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা ও জনগণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ

إِنَّنِىْ بَرَاۤءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ-اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ -

তোমরা যাদের দাসত্ব ও পূজা-উপাসনা করো, আমি তাদের সবকিছু থেকে নিঃসম্পর্ক হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি আর স্বীকার করে নিয়েছি কেবল সেই মহান সত্তাকে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। (সূরা আয্ -যুখরুফ ঃ ২৬ ও ২৭)

এর পরই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

তিনি উক্ত কালেমা (ঘোষণা)-টিকে তাঁর পিছনে স্থায়ী করে রেখে গেলেন, যেন সেই লোকেরা এ দিকে ফিরে আসতে পারে। (সূরা আয্-যুখরুফ ঃ ২৮)

হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব মা'বুদকেই অস্বীকার করলেন এবং কেবল মহান সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব স্বীকার করার কথাকেই বহাল রাখলেন। এরূপ ঘোষণা দ্বারা আসলে তিনি ভিন্নতর ভাষায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এরই ঘোষণা দিলেন এবং এ কালেমাটিকেই সমস্ত মানুষের জন্য স্থায়ী ঘোষণা বানিয়ে দিলেন। বস্তুত এ কালেমা দ্বারা একদিকে যেমন দাসত্ব-আনুগত্য, ভয়-ভীতি পোষণ, রহমতের প্রত্যাশা এবং আইন পালনের দিক দিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কেই স্বীকার করে নেওয়া হয়, তেমনি সেই সঙ্গেই এ সব দিক দিয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকেও স্বীকার করার শির্‌ককে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করা হয়। এ হলো ইসলামের খালেস তওহীদী আকীদা। এই আকীদা সুস্পষ্ট ও অকুণ্ঠভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করা ছাড়া কারো পক্ষে 'মুসলিম' হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আকীদা গ্রহণেরই নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ۚ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ

বলো হে নবী ! আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি একান্তভাবে বান্দা হবো— দাসত্ব করব কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র; তাঁর সহিত কোনোক্রমেই শির্‌ক করব না। আমি তাঁরই দিকে আহ্‌বান জানাচ্ছি এবং তাঁরই কাছে আমার আশ্রয়— চূড়ান্ত পরিণতি। (সূরা রা'দ ঃ ৩৬)

প্রত্যেকটি মানুষকে যেমন একটি নিজস্ব আকীদা গ্রহণ করতে হয়, তেমনি নিজের গৃহীত ও নিজের কাছে একমাত্র সত্য বলে বিবেচিত আকীদাটি গ্রহণের জন্য সমাজের অন্যান্য লোককেও আহ্‌বান জানাতে হয়। কিন্তু এ আহ্‌বান হতে পারে পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল করার আহবান। এ আহবান ছাড়া অন্য কোনো আহবান— আল্লাহ্‌কে অস্বীকার বা তাঁর সহিত শির্‌ক করার কোনো আহবান জানানোর কারো একবিন্দু অধিকার থাকতে পারে না। নবী-রাসূলগণ এ দাওয়াত দেওয়ার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা জীবনভর এ দাওয়াত দিয়ে গেছেন দুনিয়ার মানুষকে।

কালেমায়ে তাইয়্যেবার ইতিহাস

কালেমা তাইয়্যেবার প্রথম অংশের অর্থ ও ব্যাখ্যা এখানেই শেষ করা হলো। এখন দেখতে হবে যে, ইসলামের কালেমার প্রথম অংশে যা কিছু বলা হয়েছে তা কি দুনিয়ায় নতুন কথা, না এর পিছনে কোনো ইতিহাস আছে? কুরআনের পৃষ্ঠায়ই এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

কুরআন শরীফের পৃষ্ঠা উল্টালেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার একত্বের কথা পৃথিবীতে এই নতুন নয়; বরং দুনিয়ার মানুষের কাছে যত নবীই এসেছেন, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ উম্মতকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন— আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের মধ্যে এ ধারণাই প্রচার করেছেন। কুরআনে হযরত মুহাম্মাদ (স) কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেনঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

(হে মুহাম্মাদ!) তোমার পূর্বে যত নবীই আমি পাঠিয়েছি, তাদের সকলেরই প্রতি ওহী যোগে আমি এ আদেশ করেছি যে, আমি ছাড়া আর কেউই 'ইলাহ' বা মা'বুদ ও প্রভু নেই। অতএব তোমরা সকলে কেবল আমারই দাসত্ব ও বন্দেগী কবুল করো। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫)

এ আয়াত থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে, দুনিয়ার প্রত্যেক নবী-রাসূলই তওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক আয়াত উদ্ধৃত করছি।

১. হযরত নূহ (আ) তাঁর সমকালীন জনগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

হে জনগণ, এক আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব ও বন্দেগী কবুল করো; কারণ তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো প্রভু বা ইলাহ্ নেই। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৯)

২. হযরত ইউনুস (আ) তাঁর সমকালীন জনগণকে বহু দিন পর্যন্ত তওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন; কিন্তু জনগণ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি। অবশেষে তিনি নিরাশ হয়ে দেশ থেকে চলে যান। পথিমধ্যে তিনি নদীতে পড়ে মাছের পেটে যেতে বাধ্য হন। এ মাছের পেটে বসে হযরত ইউনুস (আ) এই দো'আ পড়েছেন ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নেই। আমি কেবল তোমারই পবিত্রতা ও গুণ-গরিমা বর্ণনা করি। নিশ্চয়ই আমি জালিম ও অন্যায়কারীদের মধ্যে একজন। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮৭)

৩. হযরত মূসা (আ) নিজের সমকালীন জনগণকে আজীবন তওহীদের দাওয়াত দিয়ে এক সময় বলেছেন ঃ

اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -

আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমাদের জন্য আর একজন মা'বুদ তালাশ করে আনব কি? অথচ একমাত্র আল্লাহ্ই তোমাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত লোকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করেছেন। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪০)

৪. হযরত সালেহ (আ) নিজ সময়ের জনগণকে আহবান জানিয়েছেন এই বলেঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

হে জনগণ! কেবল আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব ও বন্দেগী কবুল করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ মা'বুদ নেই।

৫. হযরত শু'আইব (আ) তাঁর সমকালীন জনগণকে বলেছেন ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

হে আমার জনগণ ! কেবল আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব ও ইবাদত করো; তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো মা'বুদ নেই। (সূরা হূদ ঃ ৮৪)

হযরত হূদ (আ) যখন দাওয়াত দিলেন; হে জনগণ! তোমরা কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও এবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের এবাদত পাওয়ার যোগ্য আর কেউই নেই, তখন জনগণ বলল ঃ

اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا -

তুমি আমাদেরকে এ কথা বলতে এসেছ যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই দাসত্ব-বন্দেগী করব এবং আমাদের পূর্বপুরুষ যাদের বন্দেগী করত তাদেরকে ত্যাগ করব? (সূরা আ'রাফ ঃ ৭০)

এরা মুশরিক ছিল এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগী করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও বন্দেগী করত। একান্তভাবে এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী করতে তারা রাজি হচ্ছিল না। এ বন্দেগীর অর্থ ইবাদত করা যেমন, তেমনি ভয় করা, আইন মেনে চলাও।

এখানে এ কয়টি আয়াত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

কুরআন শরীফে যত নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের তওহীদের দাওয়াত ও কাজকর্ম সম্পর্কে মোটামুটি বিবরণও কুরআন শরীফে পাওয়া যায়। কিন্তু তা সবই উল্লেখ করতে গেলে বইয়ের কলেবর বড় হয়ে যাবে। এর পর আমরা কুরআন শরীফেই দেখব শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) কে আল্লাহ্ তা'আলা কি দাওয়াত প্রচার করবার জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا هُوَاِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ -

(হে মুহাম্মাদ!) তুমি বলে দাও যে, কেবল সেই আল্লাহ্‌ই প্রকৃত মা'বুদ— তিনি এক ও একক এবং আমি নিজে তোমাদের শির্‌ক মোটেই সমর্থন করি না; আমি এ থেকে সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত। (সূরা আন'আম ঃ ১৯)

'তোমাদের শির্‌ক' অর্থ এক আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমরা আর যাকে যাকে মা'বুদ গণ্য করো এবং যাদের পূজা-উপাসনা করো, আমি কিন্তু তাদেরকে আদৌ স্বীকার করি না; বরং আমার ঘোষণা হলো ঃ

قُلْ هُوَ رَبِّىْ لَآاِلٰهَ اِلَّاهُوَ ج عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ -

বলো তিনিই আমার রব্ব্— মালিক ও প্রভু। তিনি ব্যতীত আর কেউ মা'বুদ নেই। তাঁর ওপরই আমার একান্ত ভরসা, আমি তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি। (সূরা রা'দ ঃ ৩০)

অপর এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-

বলো (হে নবী!) আমার কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মা'বুদ— সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মালিক মাত্র একজন। তোমরা কি তাঁর অধীন ও অনুগত হয়ে থাকবে? (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৮)

এ আয়াতে আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا -

বলো, (হে মুহাম্মাদ!) আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। কিন্তু আমার কাছে এই ওহী নাযিল হয়ে থাকে যে, তোমাদের মা'বুদ মাত্র একজন। অতএব যে ব্যক্তি সেই এক মা'বুদের সাক্ষ্য ও সন্তুষ্টি পাওয়ার আশা করে, তার পক্ষে (সেই এক মা'বুদের নির্দেশ মতো) সৎকাজ করা কর্তব্য এবং সে যেন তার একমাত্র মা'বুদের দাসত্ব ও বন্দেগী করার ব্যাপারে অন্য কাউকেও শরীক না করে। (কাহাফ ঃ ১১০)

এ আয়াতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্ণ দাওয়াতের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমত, তিনি বলেন যে, মানুষের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও আইন রচনাকারী মাত্র এক ও একক— আল্লাহ্।

দ্বিতীয়ত তিনি বলেন, যারা সেই এক মা'বুদের প্রতি ঈমান আনবে, তাদের সেই এক মা'বুদের সন্তুষ্টি ও সাক্ষ্য লাভ করার উপায় মাত্র দুটিঃ একটি খাঁটিভাবে এক আল্লাহ্কে স্বীকার করা, কেবল তারই হুকুম পালন করা, কেবল তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করা এবং এসব ব্যাপারে অন্য কাউকেও তাঁর সহিত শরীক না করা। অপরটি, সেই এক আল্লাহ্র নির্দেশ মতো সৎ ও নেক কাজ করা এবং পাপ ও নাফরমানীর কাজ থেকে ফিরে থাকা।

বিশ্বনবীর পূর্ণ জীবনী, কার্যাবলী এবং পূর্ণ দাওয়াত বিশ্লেষণ করলে এ তিনটি বুনিয়াদী কথা জানতে পারা যায়। বস্তুত ইসলাম ও কালেমার বুনিয়াদী কথাও এই তিনটি। এখানে প্রমাণ হয়ে গেল যে, শেষ নবী দুনিয়ায় কোনো নতুন কথা বলতে আসেননি। বস্তুত তওহীদ বা আল্লাহ্ তা'আলার একত্বের দাওয়াত দুনিয়ায় নতুন নয় মোটেই; বরং এটি পুরাতন। মানুষ সৃষ্টি যত পুরাতন, তওহীদ এবং তওহীদের এ দাওয়াতও ঠিক ততখানিই পুরাতন। আরও সত্য কথা, এ দুনিয়ায় মানুষ প্রথম যেদিন বসবাস শুরু করেছে, সেইদিন থেকে মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার ও তার দাসত্ব স্বীকার করে তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। অন্য কারো প্রতি ঈমান আনার কোনো দাওয়াত কখনো দেওয়া হয় নাই।

কালেমা তাইয়্যেবার প্রচারে বাধা

কিন্তু এই কালেমা ও তওহীদের এ বাণী দুনিয়ায় যেমন নতুন নয়, ঠিক তেমনি এই কালেমার বিরুদ্ধতা ও শত্রুতাও দুনিয়ার ইতিহাসে কিছুমাত্র নতুন বা বিস্ময়কর নয়; বরং যখনই, যে দেশেই এবং যার মুখেই এই 'চির-পুরাতন' কথাটি নতুন করে ঘোষিত ও ধ্বনিত হয়েছে, তখনই চারদিক থেকে এর বিরুদ্ধতা ও শত্রুতার পাহাড় মাথা জাগিয়ে উঠেছে। এ আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করবার জন্য স্থানীয় সকল অপশক্তি প্রাণপণে চেষ্টা করেছে; দুনিয়ার কোনো ইতিহাস পাঠকেরই এ কথা অজানা নয়।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'- (لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ)

এই ছোট্ট কালেমাটির মধ্যে এমন কি কথা বা বস্তু লুকিয়ে আছে, যে জন্য এই কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে এত দুশমনের উদ্ভব হয়? এটি বিশেষভাবে চিন্তা করার বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নবীগণ যখনই যে দেশে এবং যে সমাজেই এই ছোট্ট 'কালেমার' দাওয়াত পেশ করেছেন, তখনই সেই সমাজের অধিকাংশ লোক তাঁদের ভয়ানক শত্রু হয়ে গেছে। অথচ এর দাওয়াত পেশ করার পূর্বে প্রত্যেক নবীই নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সেই সময়ের সমস্ত মানুষের কাছে খুবই শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়পাত্র বলে বিবেচিত হয়েছেন। হযরত মূসা (আ) তৎকালীন বাদশাহ ফিরাঊনের ঘরেই লালিত-পালিত এবং বড় হয়েছেন। কিন্তু তিনি যখনই এ 'কালেমা' উচ্চারণ করলেন, অমনি তাঁর পালক পিতা ফিরাঊন হয়ে গেল তাঁর বড় দুশমন। হযরত ইবরাহীম (আ) একজন রাজ-পুরোহিতের পুত্র, পিতার আদরের সন্তান এবং সেই কারণে অন্যান্য সব লোকের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন এ তওহীদের আওয়াজ বুলন্দ করলেন তখনই তাঁর পিতা-মাতা থেকে শুরু করে তৎকালীন বাদশাহ পর্যন্ত সকলেই তাঁর ঘোরতর শত্রু হয়ে গেল। এমন কি, তারা তাঁকে চিরতরে শেষ করে দেবার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মই ছিল সকল মানুষের কাছে একটা মস্তবড় মু'জিজা— যা মানুষ সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে না। এ জন্য সকল মানুষ তাকে 'অসাধারণ' কিছু বলে মনে করত। কিন্তু তিনিও যখন একজন নবী হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও একত্বের কথা ঘোষণা করলেন, তখন তাঁর নিজ বংশের লোক ও আত্মীয়-স্বজনরাই তাঁর শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তখনকার ইহুদী সরকার তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এ তওহীদের কথা ঘোষণা করার পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশটি বছর পর্যন্ত তাঁর আপন বংশের এবং তখনকার অন্যান্য লোকদের মধ্যে জীবন যাপন

করেছেন। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি তিনি পেয়েছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি তওহীদের এ বাণী প্রথম যেদিন নিজের পরিচিত লোকদের মধ্যে প্রচার করলেন সেদিন থেকে তাঁর আপন বংশের লোকেরা প্রকাশ্যভাবে তাঁর দুশমনী করতে শুরু করেছিল। অতপর হযরতকে তাঁর নবুয়্যতের দীর্ঘ তেরটি বছর মক্কী জীবনে অত্যাচার, নির্যাতন ও নিষ্পেষণ এবং গালি-গালাজের আকাশছোঁয়া তুফানের সঙ্গে মুকাবেলা করতে— এমন কি, শেষ পর্যন্ত তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু কেন এমন হয় ? আম্বিয়ায়ে কেরাম এমন কি বড় কথা বলেছেন, যার ফলে তাঁদেরকে এরূপ দুঃখ ও নিষ্পেষণ, নির্যাতন ও নির্বাসন বরদাশ্ত করতে হয়েছিল ?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে, আম্বিয়ায়ে কেরামের ওপর দেশবাসী ও আপনজনের এরূপ অত্যাচারের মূলীভূত কারণ জানতে হলে, প্রথমেই জানতে হবে 'ইলাহ' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? তা বিস্তারিতরূপে জেনে নিতে পারলেই এ কথা খুব সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে, আল্লাহ্কে 'একমাত্র ইলাহ' মেনে নিলে বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখে কত বড় বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে।

প্রকৃত ইলাহ্ (মা'বুদ)

কুরআন শরীফের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রকৃত আল্লাহ্র পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা থেকে আরবী 'ইলাহ' (إله) শব্দের ব্যাখ্যা জানতে পারা যায়। কিন্তু কুরআনের সেই আয়াতগুলো উর্দ্ধৃত করে সেই সবগুলোর অর্থ লিখতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই এখানে আমরা সব আয়াতের শুধু সার-কথা লিখে দিচ্ছি। এখানে কুরআনের সেই আয়াতগুলো সম্মুখে রেখে যা লেখা হলো, তা-ই প্রকৃত আল্লাহ্র পরিচয় এবং তা-ই 'ইলাহ' শব্দের আসল অর্থ।

আল্লাহ তথা প্রকৃত 'ইলাহ' জীবনদাতা মৃত্যুদাতা। তিনি সমস্ত জীবকে লালন-পালন ও রিযিক দান করেন। তিনিই প্রার্থনা শ্রবণকারী ও শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনকারী। নষ্ট ও ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিসকে তিনিই আবার নতুন করে গড়তে পারেন। প্রাকৃতিক জগতে একমাত্র তাঁরই হুকুম ও আইন চলে। তিনিই সকল কাজের মূল কর্তা। তাঁরই ওপর একান্তরূপে ভরসা করতে হয়। তিনিই নিরাশার আশা; বিপদে-আপদে সব সময় কেবল তাঁরই রহমতের আশা করা যায়। মানুষের লাভ-লোকসান, ক্ষতি-উপকার কেবল তাঁরই ইচ্ছাক্রমে হয়ে থাকে। দৃশ্য-অদৃশ্য, জানা-অজানা সব কিছুই তিনি ভালো করে জানেন। তিনি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সকলের ওপর জয়ী। তিনি সব রকম শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক। তিনি সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে; কোনো ভুল-ভ্রান্তি বা পাপ-অপরাধ

তার নেই। তিনি সারা জাহানের একচ্ছত্র মালিক; সমস্ত বিশ্ব-সাম্রাজ্যের তিনিই প্রকৃত সম্রাট, শাহানশাহ ও রাজাধিরাজ। দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ ও সম্পত্তির প্রকৃত ও নিরংকুশ মালিক তিনিই। তিনি সমগ্র বিশ্বলোককে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের চালু করা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিধানের ভিত্তিতে নিজেই তা পরিচালনা করছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান দিয়েছেন। অতএব মানুষের কর্মজীবনে তাঁর আদেশ-নির্দেশই একমাত্র পালনযোগ্য আইন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সব ব্যাপারে কেবল তাঁরই আদেশ ও নিষেধ মাথা নত করে মানতে এবং পালন করে চলতে হবে। তাঁর কোনো ক্ষয়-ক্ষতি নেই; তিনি অবিনশ্বর, অক্ষয় ও চিরঞ্জীব। তিনি সব সময় বর্তমান ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তাঁর কাছে ভূত-ভবিষ্যত বা বর্তমান বলতে কিছুই নেই; সমস্ত কালই তাঁর কাছে সমানভাবে বর্তমান। তাঁর কথা ও আদেশের কোনো নড়চড় নেই। তাঁর কোনো ইচ্ছার ব্যতিক্রম করার বা তাঁর সিদ্ধান্তের বিপরীত করার ক্ষমতা কারো নেই। ভয় করার যোগ্য একমাত্র তিনিই; অন্য কারো দাসত্ব বা নিরংকুশ আনুগত্য লাভের অধিকার নেই। এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁর কেউ শরীক নেই; তিনি এক ও একক। তাঁর মর্জির বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে এমন কেউ নেই। তিনি নিজ ইচ্ছামতে কাজ করেন— কারো কথা, দো'আ বা সুপারিশ মানতে তিনি এতটুকু বাধ্য নন। তিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন, কারো মুখাপেক্ষীও তিনি নন; বরং সারে জাহানের সব কিছু কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষী— কেবল তাঁরই ওপর নির্ভরশীল। তাঁর রহমত না হলে কারো এক মুহূর্তকাল বাঁচে থাকার উপায় নেই।

'ইলাহ্' (মা'বুদ) সম্পর্কে জাহিলী মতবাদ

উপরে সংক্ষেপে ইলাহ তথা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় দেওয়া হলো। এ পরিচয় এতৎসম্পর্কিত মাত্র কয়েকটি আয়াতের সারমর্ম। নতুবা আল্লাহ্র পরিচয় লিখে শেষ করার ক্ষমতা কোনো মানুষেরই নেই। কিন্তু যা লেখা হয়েছে তা থেকে আল্লাহ্র যে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়— তা-ই তাঁর আসল সিফাত ও গুণ। কিন্তু দুনিয়ার মুশরিক লোকেরা আল্লাহ্র এ আসল পরিচয় এবং আসল গুণাবলী ভুলে গিয়ে নিজেদের খামখেয়াল অনুসারে আল্লাহ্ সম্পর্কে অমূলক কতকগুলো ধারণা রচনা করে নিয়েছে। আল্লাহ্র আসল পরিচয় না পেয়ে তারা যে কিভাবে সত্য ও শান্তির পথ ভুলে গিয়েছে এবং প্রত্যেক পদে পদে আঘাত খেয়েছে, কুরআন থেকে সংক্ষেপে আমরা এর বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি।

মুশরিকগণ একমাত্র সাহায্যদাতা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে অন্য শক্তির কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ -

আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা অন্য শক্তিকে 'ইলাহ' বানিয়ে নিয়েছে এ আশায় যে, সম্ভবত তার কাছে থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৪)

কার্যসিদ্ধির জন্য তারা মৃত মানুষকে ডাকে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَايَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ - اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ج وَمَا يَشْعُرُوْنَ لا اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ -

আল্লাহ্ ব্যতীত তারা আর যাদের (প্রভু মনে করে) ইবাদত করে, তারা একটি জিনিসও সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরকেই আর একজন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন। তারা মৃত— জীবিত নয়। তারা এতটুকুও জানে না যে, তাদের কোন দিন কোন সময় পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (সূরা নহল ঃ ২০-২১)

তারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য শক্তির দাসত্ব করে ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ م مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى-

যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য শক্তিকে মনিব ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গ্রহণ করে এবং বলে, আমরা কেবল এ উদ্দেশ্যে তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেবে। অর্থাৎ তারা প্রকৃত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার জন্য কৃত্রিম আল্লাহ্ বানিয়ে লয়। (সূরা যুমার ঃ ৩)

তারা আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করার জন্য অন্য শক্তির ইবাদত করে ঃ

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ -

তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন সব জিনিসের উপাসনা করে, তাদের উপকার বা ক্ষতি করবার কোনো ক্ষমতাই যেসবের নেই। তারা বলে যে, এরা আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করবে। (সূরা ইউনুস ঃ ১৮)

এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাদের ধারণা হলো, সরাসরিভাবে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছা যাবে না। আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছতে হলে কৃত্রিম উপাস্যদেরকে মাধ্যম ধরতে হবে।

তারা চন্দ্র এবং সূর্যের পূজা করে। মনে করে, দিন-রাত, চন্দ্র ও সূর্য বিস্ময়কর জিনিস, এরা উপাস্য না হয়ে পারে না। অথচ চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্‌রই সৃষ্ট এবং তাঁর অস্তিত্ব এবং একত্বের নির্দশন মাত্র। আল্লাহ্ বলছেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَمَرِ.

রাত ও দিন, চন্দ্র এবং সূর্য আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং একত্বের নিদর্শন; অতএব কি চন্দ্র কি সূর্য— এর কোনোটিকেই সিজদা (পূজা-উপাসনা) করিও না; কেননা এগুলোতো প্রকৃত আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও অসীম কুদরতের প্রমাণ। এগুলোকে সিজদা করে তো কিছুই লাভ হবে না।

(সূরা হা-মীম আস্ সিজদাহ ঃ ৩৭)

তারা আলেম, পীর ও পণ্ডিতদের দাসত্ব করে; তারা যাই বলে ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে তারা তাই পালন করে। অন্ধভাবে এরূপ কোনো মানুষের আনুগত্য করা ও নির্বিচারে হুকুম পালন করে চলা শির্ক। কারণ মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো হুকুম নির্বিচারে পালন করলে তাকেই আল্লাহ্র মর্যাদা দান করা হয়। আল্লাহ্ তাদের অবস্থা বর্ণনা করছেন ঃ

اِتَّخَذُوْآ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ-

তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম, পীর, পণ্ডিত ও সরদার লোকদেরকে নিজেদের 'রব্ব' বা প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তওবা ঃ ৩১)

বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিংবা প্রয়োজন মিটাবার জন্য তারা মানুষকে ডাকে। এরূপ ডাকা আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং এও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এরূপ উদ্দেশ্যে ডাকতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্কে। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

আল্লাহ্কে ছেড়ে তোমরা যাদেরকে (বিপদ মুক্তির জন্য) ডাকো তারা তোমাদেরই মতো (অক্ষম) বান্দাহ্ বই তো নয়। অতএব, (তারা সত্যই তোমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে বলে মনে করে থাকো, তবে) তাদের কাছে দো'আ করেই দেখো, তারা তোমাদের প্রার্থনার জবাব দান করুক না, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্যই হয়। (আ'রাফ ঃ ১৯৪)

তারা এক আল্লাহ তা'আলার বিধান ত্যাগ করে মনের ইচ্ছামতো কাজ করে— ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ এবং পাপ-পূণ্য কিছুরই বিচার করে না।

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ ط اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا -

যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির কামনাকে 'প্রভু' বানিয়ে লয় (কেবল প্রবৃত্তির

ইচ্ছামতো কাজ করে) তার অবস্থা কি তুমি দেখোনা? তথাপি কি তার দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করবে ? (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৪৩)

এখানে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করা হলো, একটু গভীরভাবে সেগুলোর অর্থ চিন্তা করলে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, দুনিয়ার একদল মানুষ এক আল্লাহ্কে 'ইলাহ' ও 'রব্ব' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক স্বীকার না করে, নিজের প্রবৃত্তির কামনা, ক্ষমতাবান মানুষ, বাতিলপন্থী পীর-দরবেশ ও ধর্মগুরু, চন্দ্র-সূর্য এবং নিষ্প্রাণ দেব-দেবীকে বাস্তবিকই 'খোদা' বা 'প্রভু' বানিয়ে নিয়েছে আর তাদের দাসত্ব, গোলামী, পূজা-উপাসনা ও হুকুম বরদারী করছে। কিন্তু সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এক আল্লাহ্র অস্তিত্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যকে তারা কেউই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনি; কেউই কখনো এ কথা বলেনি যে, সৃষ্টিকর্তা নেই বা তার কোনো গুণ-বৈশিষ্ট্য নেই। আসলে তারা আল্লাহ্কেই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান ও সর্বপ্রধান হুকুমদাতা বলে মানত, কিন্তু তাদের আকীদার মধ্যে মূল দোষ ছিল এই যে, তারা সেই সঙ্গে আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবদের মধ্যে ফেরেশতা, জ্বিন, মানুষ, দেব-দেবী, চন্দ্র-সূর্য-তারকা ইত্যাদিকেও আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার, সাহায্যকারী বা অনুরূপ শক্তির আধার বলে মানতো। বিপদের সময় এদের কাছে আশ্রয় চাইত; কঠিন কোনো কাজ সমাধা করার জন্য এদের কাছে শক্তি প্রার্থনা করত। মনে করত যে, এদেরও কিছু না কিছু ক্ষমতা আছে। প্রকৃত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার জন্য প্রকৃত আল্লাহ্র ক্ষমা ও রহমত পাওয়ার জন্য এবং প্রকৃত আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করাইবার জন্য তারা এসবের দাসত্ব ও পূজা করত। এদের জন্য তারা মানত মানতো এবং এরাও মানুষের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে সক্ষম— এই ধারণায় এদেরকে ভয়ও করত। আর একটি বড় দোষ এই ছিল যে, তারা আল্লাহ্র বিধান ছাড়াও নিজেদের মনের কামনা-বাসনা এবং নিজেদের তথাকথিত পীর-দরবেশ ও নেতৃবৃন্দের কথার দ্বারা হালাল হারাম ঠিক করত। তারা একথা চিন্তা করত না বা কারো কাছে জিজ্ঞাসাও করত না যে, এ ব্যাপারটি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম কি? আল্লাহ্র কাছে এটি হালাল না হারাম? তারা শুধু এটুকুই জানতে চাইত যে, কাঙ্খিত জিনিসটিকে তাদের (বাতিল) পীর দরবেশ বা নেতারা পছন্দ করেন, না অপছন্দ করেন, হালাল বলেন কিংবা হারাম মনে করেন? এ ব্যাপারে মনঃপুত ইঙ্গিত পেলে অমনি তারা সেই অনুসারে কাজ করত।

যাবতীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই মানুষকে তা দান করেছেন, এ কথার প্রতি বিশ্বাস রেখেও তারা নিজেদেরকেই এ সবের (ধন-সম্পদের) নিরংকুশ মালিক মনে করত এবং নিজেদের ইচ্ছামতো তা উপার্জন ও ব্যয়-ব্যবহার করত।

কালেমা তাইয়্যেবার বিরোধিতা করার মূল কারণ

আল্লাহ্ সম্বন্ধে দুটি ধারণা আমরা পাশাপাশি উল্লেখ করলাম। প্রথমটি প্রকৃত আল্লাহ্‌র পরিচয় আর অপরটি 'আল্লাহ্' সম্পর্কে দুনিয়ার জাহিল ও মুশরিক লোকদের ধারণার ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা খুব ভালো করে বুঝে নেওয়ার পর এ কথা বুঝতে কারো অসুবিধা হবে না যে, দুনিয়ার ইতিহাসে যখনই এবং যারই মুখে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ)-এর আওয়াজ বুলন্দ হয়েছে, তখনই সেই সমাজের গুমরাহ লোকেরা এবং তথাকার বাতিলপন্থী রাষ্ট্রপতি, পুঁজিপতি ও ধর্মপতিরা এর বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োজিত করে একে অংকুরেই বিনষ্ট করতে যারপর নাই চেষ্টা করে কেনো ? এই কালেমা শুনেই তারা কেনো একেবারে আগুনের মতো জ্বলে উঠেছে এবং বহু দিনের বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী লোকদের সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রুতা করতে তারা কেনো ওঠে পড়ে লেগেছে?

আসল ব্যাপার এই যে, এই কালেমার আওয়াজ যখনই যে-দেশে (নতুন করে) বুলন্দ হয়েছে, সে দেশের লোকেরা অমনি তা শুনে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, এর অর্থ এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা কি। তারা বুঝেছে, এই কালেমাকে সত্য বলে বিশ্বাস ও কবুল করলে এবং এই কালেমা অনুসারে নিজেদের জীবন ঢেলে তৈরী করলে কিংবা এই কালেমার শিক্ষা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে কোথায় কোথায় আঘাত লাগে— কোন কোন স্বার্থ, বিশ্বাস বা নিয়ম-পদ্ধতিকে অসংকোচে পরিত্যাগ করে নতুন শিক্ষা নতুন বিশ্বাস ও নতুন নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, কোনো সমাজে এই কালেমা উচ্চারিত ও প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমাজের লোকেরা নীতির দিক দিয়ে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ঃ একদল এই কালেমাকে বুঝেছে, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস ও কবুল করেছে, মুখে উচ্চারণ ও প্রচার করেছে এবং সমগ্র জীবন দিয়ে জীবনের প্রত্যেকটি কর্মের ভিতর দিয়ে এই কালেমার আদর্শ রূপায়িত করেছে, এর সত্যতা প্রমাণ করেছে।

আর একদল লোক এই কালেমার অর্থ বুঝেছে এবং বুঝে একে অংকুরেই বিনষ্ট করার জন্য, এর আওয়াজ অন্য কোনো মানুষের কানে যেন না পৌঁছতে পারে সে জন্য নিজেদের সর্বশক্তি লাগিয়ে ও যথাসর্বস্ব ব্যয় করে চেষ্টা করেছে। তাই এই কালেমা যেমন মানব সৃষ্টির আদি থেকে চলে এসেছে, তেমনি এর বিরোধিতাও সেই সময় থেকে হয়ে এসেছে। এ জন্য 'মুসলিম' ও 'কাফের' দুটি শব্দ বা মানুষের দুটি দল আদিকাল থেকে সমানভাবে চলে এসেছে। এ দুই দলের মধ্যে যে লড়াই, তা নীতি ও আদর্শের লড়াই এবং এ লড়াইয়ের ইতিহাসই হচ্ছে কালেমা তাইয়্যেবার ইতিহাস। ইসলামের পরিভাষায় এ লড়াইকেই বলা হয় 'জিহাদ'।

কালেমা তাইয়্যেবার শিক্ষা

মোটকথা, 'কালেমা তাইয়্যেবা' একটি বিরাট বিপ্লবী ঘোষণা। যারা এটি গ্রহণ করে, তারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত, বন্দেগী বা উপাসনা করতে পারে না; আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার জন্য কিংবা তার কাছে সুপারিশ করাবার আশায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত ও দাসত্ব অথবা হুকুমবরদারী করতে পারে না। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ এবং তাঁর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা আল্লাহ্রই হুকুম-আহকাম পালন করা ছাড়া কোনো মানুষকে— রাষ্ট্রপতি, নেতা-নেত্রী বা পীর-বুযর্গকে এবং ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো পন্থা ও পদ্ধতি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। তারা মনে করে— অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র রহমত ও সন্তুষ্টি এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য অন্তরের অন্তস্থল দিয়ে তাঁকে বিশ্বাস করে একমাত্র মা'বুদরূপে তাকেই মেনে নিয়ে তাঁরই নির্দেশ মতো জীবন যাপন করা এবং তাঁরই বিধানকে দুনিয়ার বুকে পুরোপুরি কায়েম করার জন্য 'জিহাদ' করাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। এ উপায় ও পন্থা ভিন্ন অন্য কোনো পন্থা যারা প্রচার করে, যারা বলে বেড়ায় যে, "আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে হলে অমুক দরবেশ, অমুক পীর-বুযর্গের কাছে মুরিদ হয়ে বা তার মাযারে হাজির হয়ে ফায়েজ-তাওয়াজ্জুহ হাসিল করতে হবে, নতুবা তার বদ্দো'আয় জ্বলে পুড়ে মরতে হবে" অথবা যারা "শুধু কুরআন-হাদীস অনুযায়ী আমল করাই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য যথেষ্ট নয়" বলে প্রচার করে, তারা প্রকারান্তরে শির্কেরই প্রচার করে। কারণ পীর সাহেবান ও বুযর্গানে দ্বীনের রূহানী শক্তির কাছে কোনো কিছুর আশা করা বা তাকে ভয় করা পরিষ্কার শির্ক। কালেমা তাইয়্যেবার প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তারা কখনোই সেই দাওয়াত শুনতে প্রস্তুত নয়। তারা সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠবে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার রহমত লাভের জন্য তাঁকেই ডাকব, কেবল তাঁরই গোলামী করব, তাঁর নিষিদ্ধ কাজ ও পথ ত্যাগ করব এবং তা দুনিয়ে থেকে মুছে ফেলার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করব। কেননা শাফা'আত[১] করার ক্ষমতা এবং সারা জাহানের ওপর কর্তৃত্ব কেবল এক আল্লাহ্র। তারা বলবে, মানুষের ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া কারো আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। কোনো জীবিত বা কবরে শায়িত ব্যক্তির এ ক্ষমতা আছে বলে আমরা মানি না। বস্তুত এ হলো প্রকৃত তওহীদবাদী মানুষের কথা এবং এ পথই হলো তওহীদবাদী মানুষের জন্য একমাত্র জীবন-পথ।

---

১. قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

বলো শাফা'আত সম্পূর্ণভাবে এক আল্লাহ্র ক্ষমতাধীন। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মালিকানা ও কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই। অতপর সকলকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

এ কথাই বলা হয়েছে কুরআনের এ আয়াতটিতে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

হে ঈমানদার বান্দাগণ! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং তাঁরই নৈকট্য লাভ করার উপায় তালাশ করো এবং এ লক্ষ্যে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে থাকো সম্ভবত (এ উপায়ে) তোমরা সফলকাম হতে পারবে।[১] (মায়িদাহ ঃ ৩৫)

এই কালেমার অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। অতএব প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ্ই, তিনি ছাড়া আর কেউই নন। অতএব আইন ও বিধানদাতাও কেবলমাত্র তিনিই।

অতএব যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না, কালেমা বিশ্বাসী কোনো মানুষই এর আনুগত্য করতে পারে না; এমন রাষ্ট্রের জারি করা কোনো আইন-কানুনও সে মেনে নিতে রাজি হতে পারে না।

বস্তুএই কালেমা তাইয়্যেবা'র প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারা খালেস ইসলামী হুকুমত ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতে পারে না, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে এবং তা সমর্থন করতে পারে না। মানুষের রচিত কোনো আইন-কানুনও তারা মানতে পারে না। যে আদালতে মানুষের রচিত আইনের ভিত্তিতে বিচার হয়, সে আদালতের কাছে তারা কোনো বিচারও চাইতে পারে না এবং মানুষের রচিত কোনো আইন নিয়ে তারা ওকালতিও করতে পারে না; কারণ, এর প্রত্যেকটি কাজই শির্ক এবং এ কাজ করতে গেলে মুখে আল্লাহ্র স্বীকৃতি থাকলেও কার্যত তাকে অস্বীকার করা হয়। কুরআন মজীদের বক্তব্য হলো ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط

---

১. মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ) এ আয়াতের টীকায় লিখেছেনঃ "কোনো কোনো জাহিল সুফী এ আয়াত দ্বারা পীর ধরা ফরয প্রমাণ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তা সত্য নয়।" বস্তুত এ আয়াত দ্বারা যারা পীর-ধরা ফরয প্রমাণ করতে চান, তাদের ধৃষ্টতা অমার্জনীয়। কেননা কুরআনের কোথাও 'অসীলা' শব্দের অর্থ পীর নয়। ইমাম রাগেব ইসফাহানী তাঁর 'মুফরাদাতে রাগেব ইছফাহানী' গ্রন্থে 'আল-অসীলা' শব্দের অর্থ লিখেছেন—'কোনো জিনিস পর্যন্ত পৌঁছা'। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে— ইল্ম, ইবাদত ও মহৎ কাজ সহকারে সত্য ও সঠিক পথে চলতে থাকা।

وَيُرِيْدُالشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ

اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا -

(হে নবী!) সেই সব লোক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যারা একদিকে কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এনেছে বলে মনে মনে ধারণা করে আর অপরদিকে আল্লাহ্দ্রোহী শক্তির কাছে বিচার ফয়সালা চায়, অথচ সেই আল্লাহ্দ্রোহী শক্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার আদেশই তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল? (এরা আসলে মুনাফেক) শয়তান এদেরকে গুমরাহ করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়। এ জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্র বিধান এবং রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তুমি দেখবে যে, এ সব মুনাফেক লোক তোমার পাশ কটিয়ে দূরে সরো যাচ্ছে।[১] (সূরা নিসা ঃ ৬০ ও ৬১)

অর্থাৎ এক আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব ছাড়া আর কারো প্রভুত্বকে স্বীকার করা, আল্লাহ্র আইনকে বাদ দিয়ে মানুষের রচিত আইন অনুসারে বিচার-ফয়সালা করা বা চাওয়া এবং সেই আইন নিয়ে ওকালতি করা পরিষ্কার শির্ক। তাই যখন ইসলাম-বিরোধী কোনো নেতা বা রাজশক্তি মানুষের কাছে আনুগত্য পাওয়ার দাবি করে, তখন তওহীদে বিশ্বাসী মানুষ সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠে ঃ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও ইসলামী আইনের ভিত্তিতে গড়া রাষ্ট্র এবং আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকারকারী ও তাঁর আইন অনুসরণকারী রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া আমরা অন্য কারো আনুগত্য স্বীকার করতে পারি না। যখন তাদের ওপর মানুষের রচিত আইন জারি করা হবে এবং সে অনুসারে বিচার ফায়সালা করা হবে, তখন তারা উদাত্ত কণ্ঠে জানিয়ে দেবে ঃ আমরা মানুষের রচিত আইন মানি না এবং সে অনুযায়ী কোনো বিচারও আমরা চাই না। যখন দুনিয়ায় ধন-সম্পত্তি, পুঁজি ও উৎপাদন-উপায়কে মানুষের নিজেদের মর্জিমতো কিংবা মনগড়া কোনো মতাদর্শ বা ব্যবস্থা অনুযায়ী ভোগ-ব্যবহার ও ব্যয়-বন্টনের চেষ্টা করা হবে, তখন তারা স্পষ্ট ভাষায় বলবে যে, সারে জাহানের নিরংকুশ মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ্। যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায়-উৎপাদনেরও প্রকৃত মালিক তিনিই। অতএব একমাত্র আল্লাহ্রই মর্জী ও তাঁরই দেওয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী তা ভোগ-দখল ও ব্যবহার করতে হবে।

এভাবে কালেমা তাইয়্যেবায় বিশ্বাসী মানুষের জীবনে ধীরে ধীরে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। বিপদের সময় সে আল্লাহ্ ছাড়া আর আউকেও ডাকে না।

---

১. আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ "এমন কাজের সাহায্যে আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধান করা, যাতে তাঁর সন্তোষ লাভ হতে পারে।"

কোনো দেব-দেবীকে নয়, কোনো পীর-বুযর্গকে নয়, কোনো অলৌকিক শক্তি, কোনো রাজা-বাদশাহ বা কোনো নেতাকেও নয়।[১] সে এই কালেমা পড়ে ও বিশ্বাস করে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে— এর মধ্যে যা-ই এ কালেমার বিরোধী বা বিপরীত বলে প্রমাণিত হবে, সে অমনি এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং যতদিন পর্যন্ত তা চুরমার করে এ কালেমার অনুরূপ নীতি ও ব্যবস্থা কায়েম করতে না পারবে, ততদিন সে অবিশ্রান্তভাবে সে জন্য চেষ্টা-সাধনা এবং লড়াই-সংগ্রাম করে যাবে।

হযরত ইবরাহীম (আ) ঠিক তাই করেছিলেন। কুরআনের ভাষায় তাঁর ঘোষণা ছিল ঃ

إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ -

আমরা তোমাদের ও তোমাদের সেই মা'বুদদের— আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করো— সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলাম, সব দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলাম। আমরা তোমাদের সব কর্তৃত্ব অস্বীকার ও অমান্য করলাম এবং এ মুহূর্ত থেকে আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা স্পষ্টভাবে শুরু হয়ে গেল চিরদিনের তরে। যতদিন তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার ও তাঁরই অনুগত না হবে ততদিন পর্যন্তই এ অবস্থা স্থায়ী থাকবে। (সূরা মুমতাহিনা ঃ ৪)

বস্তুত তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির এই ঘোষণা। কোনোদিনই এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ঘোষণাকারীই প্রকৃত 'বিদ্রোহী' এবং 'বিপ্লবী'— তওহীদবাদী অর্থাৎ এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী।

এই কালেমার জন্য প্রয়োজন হলে তওহীদবাদী মানুষকে নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে। কালেমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত একজন মানুষ থাকে স্বাধীন ও যথেচ্ছাচারী— নিজের মনে যা আসে অবাধে সে তাই করে, করতে পারে; কিন্তু এই কালেমা পাঠ করার পর তার সেই স্বাধীনতা আর থাকে না। এর পর তাকে প্রত্যেকটি কাজই চিন্তা করে করতে হবে এবং যখনই কোনো নিষিদ্ধ কাজ সম্মুখে আসবে, অমনি তা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে।

---

১. কোনো চিকিৎসককে ডাকলে ও তার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করলেও চিকিৎসক বা ঔষধই তার রোগ সেরে দেবে এ কথা সে আদৌ মনে করবে না; বরং মনে এ বিশ্বাস অবিচল রাখবে যে, প্রকৃতপক্ষে রোগ সারবেন তো আল্লাহ্ই। তবে এগুলো ব্যবহার করছি কেবল তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য।

অন্য কথায়, যতদিন সে আল্লাহ্‌র গোলামী থেকে আযাদ বা স্বাধীন ছিল, ততদিনই সে ছিল প্রকৃতপক্ষে গোলাম— প্রবৃত্তির গোলাম, দেশ-চলতি প্রথা ও মানব রচিত আইনের গোলাম এবং পীর-মুরশিদ ও নেতৃবৃন্দের গোলাম। কিন্তু যখনই সে পড়ল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' অমনি এই সকলের গোলামীর শিকল তার গলদেশ থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ে গেল এবং কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলার গোলামী কবুল করার ফলে সে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করল। ইসলামে এরই নাম সত্যিকার স্বাধীনতা।

এক্ষণে যাদের প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের ওপর, যাদের পীরগিরি, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ওপর এবং যাদের ধন-মাল, মনগড়া অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় গদি ও সমাজ ব্যবস্থার ওপর এই কালেমার প্রত্যক্ষ আঘাত পড়ে, তারা যদি কালেমাকে গ্রহণ না করে এবং এর বিরোধী সবকিছু অকাতরে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত না হয়, তবে তারা যে এই কালেমার বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর হবে, তা আর বিচিত্র কি? যাদের মনে সত্যের পিপাসা ছিল, তারা সত্য পেয়ে তা গ্রহণ করল। অন্য লোকদের মধ্যে কেউ মূর্খতাবশত আর কোনো কোনো লোক স্বার্থ ও অহমিকার বশবর্তী হয়ে এই কালেমার প্রকাশ্য দুশমনী করতে শুরু করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আম্বিয়ায়ে কেরামের যত বিরোধিতা ও দুশমনী করা হয়েছে, এই কালেমাই হলো তার মূল কারণ।

দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

কালেমা তাইয়্যেবার প্রথম অংশ 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্‌'র অর্থ এবং এর ব্যাখ্যা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো। প্রথম অংশ বুঝে নেওয়ার পর কালেমার শেষ অংশ অর্থাৎ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র অর্থ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। এ অংশের সহজ অর্থ হচ্ছেঃ 'হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌ তা'আলার রাসূল'।

তওহীদের যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে করেছি, তা স্বীকার করে নিলে জীবনে প্রত্যেকটি কাজ এবং প্রত্যেকটি পদে পদে আল্লাহ্‌র হেদায়েত ও আইন অনুযায়ী চলা আমাদের একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তা-ই নয়, আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া আমরা আর কিছুই মানতে ও অনুসরণ করতে পারি না এবং কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমাদের সারা জীবন কাজ করে যেতে হয়। এবাদত-বন্দেগী, রাজনীতি ও রাষ্ট্র-পরিচালনা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা, লেন-দেন ও বেচা-কোনো, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-সন্ধি, বন্ধুতা-শত্রুতা— মোটকথা ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি কাজই কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আইন অনুযায়ী সমাধা করা একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন

মুশকিল হলো যে, আমরা আল্লাহ্‌র আইন কোথায় পাব এবং কেমন করে জানব যে, আল্লাহ্‌ কোন কাজে সন্তুষ্ট হন আর কোন কাজে অসন্তুষ্ট হন? জীবন যাপনের কোন পন্থা এবং ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলা পছন্দ করেন আর কোনটি করেন অপছন্দ, তাই বা আমরা বুঝতে পারব কিরূপে? আর যতক্ষণ পর্যন্ত জানতে ও বুঝতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যতই তওহীদ বিশ্বাসী হই না কেন, সে তওহীদ অনুযায়ী কাজ করতে আমরা কোনোদিনই পারব না। এখানে আরও একটি ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ। বড় বড় ও মহামূল্য নীতিকথা বলার লোক দুনিয়ায় কোনো দিনই কম পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই নীতি নিজে অনুসরণ করে তা বাস্তবায়িত করার পন্থা দেখিয়ে দেওয়ার লোক খুব বেশি কোনোদিনই পাওয়া যায়নি। তাই কালেমার প্রথম অংশের প্রতি বিশ্বাসী লোকদের জন্য নেতা বা পথ-প্রদর্শক হিসাবে একান্ত প্রয়োজন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজে পুতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী হয়ে এবং আল্লাহ্‌র বিধান নিজে পালন করে লোকদেরকে তা অনুসরণ করার বাস্তব পন্থা দেখিয়ে দেবেন। এরূপ নেতৃত্ব না পেলে মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র বিধান পালন করা সম্ভব নয় আর তা না পেলে কোনোদিনই আমরা শান্তি ও কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হবো না। কালেমা তাইয়্যেবার প্রতি আমাদের ঈমানও আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত হতে পারবে না। ফলে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে আসবে। এ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

নবীর প্রয়োজনীয়তা

ব্যাপারটি সত্যিই একটু ভেবে দেখবার বিষয়। আল্লাহ্‌ যদি কেবল এতটুকু বলে দিতেন যে, তোমরা কেবল আমারই আইন ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করো, মানুষের রচিত কোনো আইন বা মনগড়া কোনো পন্থা তোমরা স্বীকার করো না— তা করলে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে এবং মুশরিকদের জাহান্নামে না গিয়ে উপায় নেই আর সেই সঙ্গে যদি তিনি (আল্লাহ্‌ তা'আলা) আইন ও বিধান নাযিল না করতেন এবং মানুষকে না জানিয়ে দিতেন যে, এ কাজে আমার সন্তুষ্টি আর এ কাজ আমি পছন্দ করি না, তা হলে এ অক্ষম মানব জাতির দুর্গতি এবং দুর্ভাগ্যের কোনো অন্ত থাকত না। আপনাকে যদি কোনো উড়োজাহাজের পাইলট করে আকাশ-পথে ঢাকা থেকে জেদ্দা যাওয়ার জন্য ঐ জাহাজে বসিয়ে দেওয়া হয়, অথচ আপনি না জানেন উড়োজাহাজ চালাতে আর না চেনেন জেদ্দা যাওয়ার পথ, তাহলে আপনার যে কতখানি বিপদ হবে, তা আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন। দুনিয়ার মানুষ এমন নির্বুদ্ধিতা করলেও করতে পারে, কিন্তু দয়াময় ও মেহেরবান আল্লাহ্‌ তা'আলা তা কখনো করেননি। তিনি যে দিন দুনিয়ার বুকে মানুষ পাঠিয়েছেন সেইদিন থেকে তার কাছে দুনিয়ার জীবন পরিচালনার জন্য

একটা পরিপূর্ণ বিধানও প্রেরণ করেছেন। এ জীবনক্ষেত্রে কোন কাজ কিভাবে সম্পাদন করতে হবে তা তিনি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি এও বলে দিয়েছেন যে, অমুক অমুক কাজে তাঁর সন্তুষ্টি আছে আর অমুক অমুক কাজে তিনি অসুন্তুষ্ট হয়ে থাকেন এবং স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, অমুক পথে যে চলবে সে আমার সন্তুষ্টি পাবে আর অমুক পথে যে চলবে সে জাহান্নামে জ্বলতে বাধ্য হবে। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রদত্ত বিধান কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য সুযোগ্য ওস্তাদ ও পথ-প্রদর্শকের ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।

ঠিক এ কারণেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে লোকদের কালে আল্লাহ্র এ বিধান নিয়ে এসেছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম। তন্মধ্যে প্রথম নবী হলেন আদি মানব হযরত আদম (আ) এবং সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)। শেষ নবীর ইন্তেকালের পর প্রত্যেক যুগে তাঁর প্রতিনিধি একদল লোক তাঁরই পেশকৃত এ 'কালেমা'র প্রচার এবং একে রাষ্ট্রীয় শক্তির মজবুত ভিত্তিরূপে কায়েম করতে যত্নবান থাকবে।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ -

প্রতিটি যুগের গোটা জনগোষ্ঠীর কাছেই আমরা নবী পাঠিয়েছি (এ বাণী নিয়ে যে,) কেবল আলাহ্ তা'আল্লারই দাসত্ব করো এবং আল্লাহদ্রোহী শক্তিগুলোকে অমান্য করো— অস্বীকার করো। (সূরা নহ্ল ঃ ৩৬)

নবীর কাজ

নবীগণ দুনিয়ায় আসেন আল্লাহ্র বিধান নিয়ে। তাদের আসার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, যারা কালেমা তাইয়্যেবার প্রথম অংশ— 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বিশ্বাস করে আল্লাহ্ তা'আলার একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্বীকার করবে, তারা যেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীদের প্রদর্শিত নিয়মে ও পন্থায় কাজ করে আল্লাহ্র খালেস বান্দাহ্ হতে পারে। নবীগণ নিজেরাই আল্লাহ্র বিধান মতো কাজ করে মানুষকে দেখিয়ে দেন। তাঁরাই ভালো করে জানেন আল্লাহ্র বিধান কি এবং কোন নিয়মে জীবন যাপন করলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। নবীগণ ছাড়া মানুষের মধ্যে কেউই তা জানতে পারে না। কাজেই সর্বসাধারণ মানুষের কর্তব্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বিশ্বাস করার পর নবীদের প্রতি ঈমান আনা, পরিপূর্ণরূপে নবীদের আনুগত্য স্বীকার করা এবং আরও একটু অগ্রসর হয়ে ঘোষণা করা— 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'— মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। ঠিক এ কারণে প্রত্যেক নবীই যেমন দুনিয়ায় আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও তওহীদের বাণী প্রচার করেছেন তেমনি লোকদের কাছে তাদের নিজেদের আনুগত্যেরও দাবি করেছেন।

إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ -

আমি তোমাদের প্রতি (আল্লাহ্‌র) বিশ্বস্ত নবী, অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমাকে মানো ও অনুসরণ করো। (সূরা শু'আরা ঃ ১০৭ ও ১০৮)

'বিশ্বস্ত নবী' অর্থ দুনিয়ার মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে বিধান তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন, তা তিনি যথাযথভাবে লোকদের কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং বাস্তবে তা অনুসরণ ও পালন করে দেখিয়েছেন। এ আমানতদারীতে তিনি একবিন্দু খেয়ানত বা বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেন নাই।

আল্লাহ্ নিজেও প্রত্যেক নবীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করার সুস্পষ্ট আদেশ ও অনুমতি দিয়েছেন ঃ

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ -

আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো ও রাসূলের অনুগত্য করো।
এবং

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ -

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে ঠিক আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে। (সূরা নিসা ঃ ৮০)

কারণ নবীগণ নিজেদের ইচ্ছামতো বা অন্য কারো আদেশ মতো কিছুই করেন না। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে যখন যে আদেশ নাযিল হয়, সর্বপ্রথম নবী তা নিজের কাজের ভিতর দিয়ে বাস্তবায়িত করেন।

اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ -

আমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, এ ছাড়া আর কিছুই আমি করি না। (সূরা আন'আম ঃ ৫০)

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় নেতা করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এবং বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا -

নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের ব্যক্তিত্বে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে— তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের আশা করে এবং খুব বেশি করে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে। (সূরা আহযাব ঃ ২১)

এ সব আয়াত থেকে একথা পরিষ্কার রূপে বুঝতে পারা যায় যে, খালেসভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং একান্তভাবে তাঁর আনুগত্য করার পথ হলো জীবনের প্রতিটি কাজে কেবল নবীগণের অনুসরণ করা এবং দুনিয়ার আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করা। বস্তুত নবীর আনুগত্যই হলো আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বাস্তব রূপ।

কালেমার পরিপূর্ণতা

আগেই বলেছি, হযরত আদম (আ) থেকে নবী প্রেরণের যে ধারা চলেছে, তা হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। এই শেষ নবীর কাছে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে সর্বশেষ বিশ্বমানবের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য যে বিধানখানি এসেছে, তাঁর নাম কুরআন শরীফ। এখন যারাই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'— কালেমার এ প্রথম অংশ বিশ্বাস করবে, এর শেষ অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' টুকুও তাদের বিশ্বাস করতে এবং মেনে নিতে হবে। কারণ বর্তমান দুনিয়ায় মানুষের জন্য জীবন যাপনের নির্ভুল ও সুন্দর ব্যবস্থা এবং ইহকাল ও পরকালে তার সর্ববিধ সুখ-শান্তি লাভ করার একমাত্র উপায় হলো পবিত্র কুরআন ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আদর্শ জীবন। আল্লাহ্‌র শেষ কিতাব হিসাবে কুরআন মজীদ যেমন অপরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের কাছে বর্তমান আছে, তেমনি উজ্জ্বল ও স্পষ্টত্বর হয়ে বর্তমান আছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মহত্তম জীবনের প্রতিটি দিক। তাই 'কালেমা তাইয়্যেবা' এখানে এসে পূর্ণতা লাভ করল— 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ অংশের সহিত যুক্ত হলো 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এর ফলে মুহাম্মাদ (স)-ই হলেন কালেমা বিশ্বাসীদের জন্য চিরন্তন ও চিরকালীন শুভ্র সমুজ্জ্বল আদর্শ নেতা। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ –

হযরত মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল এবং সর্বশেষ পয়গাম্বর। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৪০)

এ ঘোষণা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তার পর আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না— আসার কোনো প্রয়োজনই নেই। কেননা মানুষের জন্য যে আইন ও বিধান দরকার, কুরআন মজীদরূপে তা তাদের কাছে বর্তমান আছে এবং যে আদর্শ নেতৃত্বের প্রয়োজন তা মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যক্তিত্বে চির অম্লান হয়ে রয়েছে— থাকবে চিরকাল, থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র বিধান কুরআন মজীদ অনুযায়ী জীবন যাপন করেছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী একজন মুসলমানকে কিভাবে জীবন যাপন করতে হয়। এ কুরআনের ব্যাখা তিনিই দিয়ে গেছেন মুখের কথা ও বাস্তব কাজ দ্বারা। এর পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বর্ণনা সুসংরক্ষিত রয়েছে দুনিয়ার মুসলমানদের কাছে হাদীস বা সুন্নতের মাধ্যমে। এ কুরআনের বিধান অনুযায়ী গঠিত লোকদের এক আদর্শ সমাজও তিনি রেখে গেছেন। এ আদর্শ সমাজও দুনিয়ার মানুষের জন্য রাসূলের উপস্থাপিত আদর্শের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হয়ে আছে পূর্ণ শুভ্রতা সহকারে। তাই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়্যত ও রেসালাত শাশ্বত ও চিরন্তন।

তাই কালেমার প্রথম অংশের সহিত শেষ অংশ মিলিয়ে যখন আমরা পড়ি— "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌" তখন আমরা যেমন বলি যে, আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকেও প্রভু ও আইনদাতা বলে মানি না, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকেও প্রভুত্ব, নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী ও আইনদাতা স্বীকার করি না, সেই সঙ্গে আমরা একথাও ঘোষণা করি যে, আল্লাহ্‌র যে আইন-বিধান, জীবন যাপন প্রণালী এবং আল্লাহ্‌কে পাওয়ার যে পন্থা ও পদ্ধতি শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রচার করেছেন আমরা কেবল তা-ই মানি, তা-ই অনুসরণ করি; তা ছাড়া অন্য কিছু মানতে আমরা মাত্রই প্রস্তুত নন, কেননা তিনিই আমাদের চিরকালীন অনুসরণীয় নেতা। তার নীতির পরিপন্থী নীতি আমরা মানি না যেমন, তেমনি তাঁর নেতৃত্বের পরিপন্থী নেতৃত্বও আমরা মানতে প্রস্তুত নই। হযরতের প্রচারিত পন্থা ও পদ্ধতির যা বিরোধী অথবা যা হযরতের উপস্থাপিত পন্থা নয় অথচ তাঁরই পন্থা বলে সমাজে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমরা এরও বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করি। এই পূর্ণ 'কালেমা' পাঠ করার পর যদি আমরা হযরতের উপস্থাপিত পন্থা ছেড়ে দেই এবং তার পরিবর্তে কোনো আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির বা বেঈমান লোকের দেওয়া আইন মেনে চলি, তাঁর নীতি ও নেতৃত্বের পরিপন্থী কোনো নীতি ও নেতৃত্ব অনুসরণ করি, তা হলে আমাদের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক আর কেউই হতে পারে না।

এই পূর্ণ 'কালেমা' পাঠ করার এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) আমাদের একমাত্র 'আদর্শ নেতা'। দুনিয়ায় সুষ্ঠভাবে জীবন যাপনের ব্যাপারে অথবা জীবনের কোনো ক্ষেত্রে— রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে হযরত মুহাম্মাদ (স) ছাড়া অন্য কাউকেও আমরা 'আদর্শ নেতা' বলে স্বীকার করতে পারি না এবং অন্য কারো নীতি অনুসারে আমরা কোনো কাজই সম্পন্ন করতে পারি না। এ 'কালেমা' পড়ে আমরা উচ্চৈঃস্বরে এ কথাই ঘোষণা করে থাকি যে, দুনিয়ার

নেতৃত্বের গদীতে সমাসীন হে বড় বড় মোহন্তগণ! তোমরা মিথ্যাবাদী, তোমরা অনধিকার চর্চাকারী, নেতৃত্ব করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই— যোগ্যতাও নেই। আমরা তোমাদেরকে 'নেতা' বলে আদৌ স্বীকার করি না। আমাদের 'নেতা' হলেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁরই উপস্থাপিত বিধান অনুসারে যিনি আমাদের সংগঠিত ও পরিচালিত করবেন এবং নেতৃত্ব দেবেন তাঁরই নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য— তিনি। এতদ্ব্যতীত আর সকলেরই নেতৃত্ব মিথ্যা ও ধ্বংসাত্মক এবং তা নিস্তনাবুদ করার জন্যই আমরা আমরণ ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

এখানে কালেমা সংক্রান্ত একটি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করবে সে চিরদিন এ থেকে প্রভুত 'কল্যাণ' লাভ করতে থাকবে এবং সকল প্রকার আযাব ও বিপদ-আপদ তার কাছে থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু কালেমার হক আদায় করতে কুণ্ঠিত হলে এ থেকে কোনো সুফলই সে লাভ করতে পারবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, এর হক আদায় করতে কুণ্ঠিত হওয়ার অর্থ কি? হযরত মুহাম্মাদ (স) বললেন ঃ "কালেমা পাঠ করে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্র নাফরমানী করলে, আল্লাহ্র প্রকাশ্য নাফরমানী করতে দেখেও এর প্রতি হৃদয়মনে কোনোরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদ্রেক না হলে এবং তা বন্ধ করতে প্রাণপণে চেষ্টা না করলেই কালেমার হক নষ্ট করা হয়।" (তারগীব ও তারহীম)

এ হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পরা যায় যে, কালেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ মা'বুদ নেই) পাঠ করার অর্থ শুধুমাত্র এর্কজন অলৌকিক মা'বুদকে স্বীকার করে নেওয়া এবং তাঁকে মুখে মুখে স্বীকার করে তাঁর যৎকিঞ্চিত ইবাদত (উপাসনা) করাই নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে মানুষের বাস্তব কর্মজীবনের সহিত এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই কালেমা পাঠ করে একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হলে অতপর মানুষের কর্মজীবনে সেই এক আল্লাহ্ তা'আলারই দেওয়া বিধান পালন করতে হবে। তাঁর আদেশ ও নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। তাঁর দেওয়া আইন-বিধানকে এ দুনিয়ায় কায়েম করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে যে সব মানুষ নিজেদের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব তথা নিজেদের রচিত আইনের রাজত্ব কায়েম করতে চায়, তাদেরকে নির্মূল করতে হবে। কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করার এ-ই একমাত্র উদ্দেশ্য। এই কালেমা পাঠ করে যদি তদানুযায়ী এর উদ্দেশ্য লাভ করতে চেষ্টা না করা হয় তবে কালেমা পাঠের কোনো সুফলই পাওয়া যাবে না। তখন এই কালেমা পাঠ করা বা না-করা এবং বিশ্বাস করা বা না-করার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনোই পার্থক্য থাকে না; বরং সত্য বলতে কি, এমতাবস্থায় 'কালেমা' পাঠ করে এর অপমান না করাই বরং অনেক ভালো।

যে ব্যক্তি এই কালেমা পড়েও মনে করে যে, আল্লাহ্‌র পুলিশ, আদালত কিংবা জেল কোথাও নেই, কাজেই তাঁর আইন ভঙ্গ করা সহজ। কিন্তু আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির রাজত্ব, তার পুলিশ, সৈন্য, আদালত এবং জেলখানা চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে, কাজেই তার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়, সেই ব্যক্তির পক্ষে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলা একেবারে অর্থহীন। এমন ব্যক্তি অন্তর দিয়ে কখনো আল্লাহ্‌কে একমাত্র প্রভু ও বাদশাহ্‌ এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে একমাত্র আদর্শ নেতা বলে বিশ্বাস করে না। কাজেই তার এ মুখে কালেমা পাঠ প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ্‌ সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

তোমার প্রভুর শপথ, তারা কখনোই ঈমানদার হতে পারে না, যদি তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে (হে নবী) তোমাকেই একমাত্র বিচারক বলে স্বীকার না করে এবং তুমি যে ফয়সালা করবে তা অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে না লয়। (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

'কালেমা তাইয়্যেবা'র এ ব্যাখ্যার পর প্রত্যেক কালেমা-বিশ্বাসী মুসলমানই নিজের সম্পর্কে ফয়সালা করতে পারে যে, সে নিজে কি রকম মুসলমান— পুরো মুসলমান না আধা মুসলমান, খাঁটি মুসলমান, না মুনাফিক মুসলমান ?

এখানে পরিষ্কার করে জেনে নেওয়া দরকার যে, যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত ব্যাপারে কেবল আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলের হেদায়েত মেনে কাজ করে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই খাঁটি ও আসল মুসলমান বলে বিবেচিত হতে পারে— অন্য কেউ নয়।

এ কালেমার বিস্তারিত অর্থ আপনি যদি বুঝে থাকেন এবং বুঝে শুনেই যদি এ কালেমার সাক্ষ্য আপনি দিয়ে থাকেন, তা হলে এখন আপনার চিন্তা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও অভিরুচি এবং আপনার সমগ্র জীবন এ কালেমারই নির্দেশ মতো চলবে। এখন আপনার মন-মগজে এমন কোনো চিন্তা-কল্পনাই আসতে পারে না, যা এ কালেমার বিরোধী। এখন আপনাকে চির-জীবনের জন্য এ ফয়সালা করতে হবে যে, যে কথা বা যে নীতি এ কালেমার বিরোধী, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা— একমাত্র এ কালেমাই সত্য। আপনার জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে এ কালেমাই হবে আপনার পরিচালক ও নির্দেশদাতা। এই কালেমা পড়ে আপনি কাফেরদের ন্যায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী থাকতে পারেন না। মন যা চায়, তাই আপনি করতে পারেন না। এখন আপনি এমন কোনো সমাজ, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থাও মেনে নিতে পারেন না, যা মহান সৃষ্টিকর্তার প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্ব ও আইন-বিধানের

ওপর ভিত্তিশীল এবং এর অনুসারী নয়, যা মানুষকে আল্লাহ্‌র অনুগত না বানিয়ে মানুষের গোলামী করতে বাধ্য করে। এমন কোনো শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাও আপনি বরদাশত করতে পারেন না, যা তরুন বংশধরদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ভাবধারায় সমৃদ্ধ করে না; বরং নাস্তিক নীতিভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন বানায়। এখন আপনি কোনো ফাসেক বা কাফের ব্যক্তিকে আপনার 'নেতা' রূপে মেনে নিতে পারেন না; আপনি ইসলাম বিরোধী আদর্শ ও নিয়মে গঠিত কোনো দল বা সমিতি ও সংস্থার সদস্য হতে পারেন না। এমন কোনো দলে আপনি যোগ দিতে পারেন না, যার আন্দোলন ও চেষ্টা-সংগ্রামের মূল লক্ষ্য দুনিয়ায় কোনো অনৈসলামিক বিধান প্রতিষ্ঠিত করা বা নিছক বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করা। এখন আপনি নিজেকে আপনার নিজের কিংবা অন্য কাউকেও তার ধন-সম্পত্তির নিরংকুশ মালিক বলে মেনে নিতে পারেন না। রুজী-রোজগার, অর্থোপার্জন, অর্থ ব্যয় ও ব্যবহারে এমন কোনো পন্থা আপনি অবলম্বন করতে পারেন না, যা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। এক কথায়, এই কালেমা অনুসরণ করেই আপনাকে সমগ্র জীবন যাপন করতে হবে। এই কালেমা যা-ই করতে বলবে, তাই আপনাকে করতে হবে— তাতে যদি আপনার লাখ টাকার ক্ষতি হয় কিংবা আপনার জীবনকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করতে হয়, তবুও। আর এই কালেমা আপনাকে যে কাজ করতে নিষেধ করবে তা আপনি করতে পারবেন না— তাতে যদি আপনার অনেক কিছু হারাতেও হয়, এমনকি আপনাকে মৃত্যুও বরণ করতে হয়, তবুও সেই কাজ আপনি করতে পারবেন না। মোটকথা, এ কালেমার রজ্জু দ্বারা আপনার সমগ্র জীবনকেই বেঁধে নিতে হবে। হযরত মুহাম্মাদ (স) এ কথাটি বড় সুন্দর উদাহরণের দ্বারা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اٰخِيَّتِهٖ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اٰخِيَّتِهٖ -

> মুমিন ব্যক্তি এবং তার ঈমানের উদাহরণ— যেমন রশি দ্বারা খুঁটির সহিত বাঁধা একটি ঘোড়া। ঘোড়াটি ঘুরে-ফিরে সেই খুঁটির দিকেই যেতে বাধ্য হয়। মুমিন ব্যক্তির গলদেশও ঈমানের রশি দিয়ে বাঁধা, সে তার বাইরে যেতে পারে না। (বায়হাকী)

এভাবেই যদি আপনি কালেমা তাইয়্যেবা পড়তে পারেন, কালেমা পড়ে যদি আপনি নিজেকে এভাবে গঠন করতে পারেন তবেই আপনি খাঁটি মুসলমান হতে পারবেন, তবেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে এবং পরকালে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে ও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এরূপ বিপ্লবী ভাবধারা সম্পন্ন হয়ে আপনি একাকী কোথাও সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতে পারবেন না; সেজন্য অনুরূপ ভাবধারাসম্পন্ন এমন এক সমাজ সমষ্টিও আপনাকে গঠন করতে সচেষ্ট হতে হবে যেখানে পুরোপুরিভাবে এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও আনুগত্য রক্ষা করে পূর্ণাঙ্গভাবে জীবন যাপন করা সম্ভবপর হবে। কেননা এ কালেমাকে ব্যক্তি জীবনের সংকীর্ণ পরিসরে পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করা যায় না, সেজন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজের একান্ত প্রয়োজন।

শির্ক ও বর্তমান মুসলমান

কালেমা তাইয়্যেবার এ বিস্তারিত ব্যাখ্যা থেকে তওহীদের তত্ত্বকথা আপনারা জানতে পরলেন। এ তওহীদের ঠিক বিপরীত হলো শির্ক। তওহীদকে পূর্ণরূপে পেতে হলে আমাদের যেমন শির্ক থেকে বেঁচে থাকতে হবে, তেমনি তওহীদের অর্থ ও মর্মকে আরও ব্যাপক ও আরও খোলাখুলিভাবে বুঝতে হলে শির্কের পরিচয়টিও আমাদের লাভ করা দরকার।

সাধারণত মুসলমানগণ মনে করেন যে, দুনিয়ার নবীগণ যে সব জাতির কাছে তওহীদ ও 'কালেমা তাইয়্যেবা'র দাওয়াত দিয়েছেন তারা সকলেই নাস্তিক ছিল, আল্লাহ্র অস্তিত্ব তারা স্বীকার করত না, কিংবা আল্লাহ্কে তারা মানতো না। তারা কেবল দেবদেবী বা মূর্তিরই পূজা করত— এ জন্য তারা মুশরিক ছিল। কিন্তু আমরা আল্লাহ্কে মানি, তাঁর রাসূলকে মানি, কাজেই আমরা কোনো প্রকারেই মুশরিক হতে পারি না। আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাহদেরকে যদি আমরা বিপদের সময় ডাকি কিংবা তাদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের কবরস্থানে মেলা বসাই, মানত মানি আর সেজদা করি অথবা আমাদের আলেম, পীর ও নেতৃবৃন্দ কিংবা আমাদের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার দাসত্ব করি, তবে আমাদের তওহীদ-বিশ্বাস এবং আমাদের মুসলমানিত্ব এতটুকুও নষ্ট হবে না— শির্ক আমাদের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ পাবে না। আমরা চিরকাল তওহীদবাদীই থেকে যাব।

কিন্তু কুরআন পাঠ করলেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, মুসলমানদের এ ধারণা একেবারে ভুল— এ ধারণা কুরআনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম কি জিনিস তা না জানার ফলেই আমাদের মধ্যে এসব ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত কুরআন পাঠে আমরা জানতে পারি যে, দুনিয়ার প্রত্যেক কাফের বা মুশরিক জাতি আল্লাহ্কে মানতো। তারা বিশ্বাস করতঃ আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, পানি প্রভৃতি সব জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা। জীবনদাতা, রিযিকদাতা, মৃত্যুদাতা ও বিশ্ব প্রকৃতির পরিচালক হিসাবেও তারা আল্লাহ্কে

মানত। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা আল্লাহ্ ছাড়া এসব ব্যাপারে অন্যান্য শক্তির দখল বা অংশীদারিত্ব আছে বলেও বিশ্বাস করত আর এই হলো শির্ক। এ কারণে আল্লাহ্ আছেন একথা তারা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুশরিক নামে অভিহিত করেছেন। এখন ভাববার বিষয় এই যে, এ সব ধারণা যদি মুসলমানদের মধ্যেও পাওয়া যায়, মুসলমানও যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য শক্তিতে আল্লাহ্র গুণ ও শক্তি আছে বলে মনে করে, এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী হয়েও আল্লাহ্র আইন-বিধান বাদ দিয়ে মানুষের রচিত আইন-বিধান মেনে চলতে মনে-প্রাণে যদি রাজি হয়, তা হলে মুসলমানও কি মুশরিক হয়ে যাবে না? মুশরিক, আহলি কিতাব, মুনাফিক প্রভৃতির যেসব কাজ শির্ক বলে অভিহিত হতে পারে এবং যে জন্য তারা মুশরেক নামে পরিচিত হলো সেই বিশ্বাস বা সেই কাজ যদি মুসলমানগণও নিজেদের মধ্যে স্থান দেয়, তবে তারা মুশরিক হবে না কেনো ? এর কি সত্যই কোনো যুক্তি আছে ? বাস্তবিকই একজন মানুষের পক্ষে যে কাজ পাপ, অন্য একজনের পক্ষে তা পূণ্য হওয়ার বা পাপ না-হওয়ার কোনো কারণই থাকতে পারে না। আল্লাহ্র কাছে এমন পক্ষপাতিত্ব নেই— থাকা অসম্ভব। সমস্ত মানুষ তাঁরই সৃষ্টি, সমানভাবে তাঁরই বান্দাহ্; যে লোক যে কাজ করবে— সে কাজের ফল সে-ই ভোগ করবে। বিষ খেলে অন্য লোক মরে যাবে, কিন্তু মুসলমান মরবে না; আগুনে পুড়লে অন্য ধর্মের লোক জ্বলবে, কিন্তু মুসলমান জ্বলবে না— এমন কোনো কথাই হতে পারে না। বরং একটু চিন্তা করলে আপনারা একথাও মানতে বাধ্য হবেন যে, যে-কাজ বা বিশ্বাস দুনিয়ার অন্যান্য জাতির মধ্যে থাকলে তারা মুশরিক হয়ে যায়, সেই কাজ এবং সেই বিশ্বাস যদি তওহীদবাদী মুসলমানদের মধ্যেও পাওয়া যায়, তবে তারা আরও বেশি কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে।

এখন আপনি যদি কুরআনের মানদণ্ডে বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা যাচাই করেন, তবে একথা মানতে বাধ্য হবেন যে, অসংখ্য শির্কী বিশ্বাস ও কাজ এখনকার মুসলমানদের মধ্যে বর্তমান দেখতে পাওয়া যায়। বহু মুসলমান বিশ্বাস করে থাকে যে, তাদের পীর-দরবেশ অদৃশ্য জগতের খবর রাখেন; তাদের নেক নজরে মানুষের উপকার এবং তাদের বদ-দো'আয় মানুষের সমূহ ক্ষতি হতে পারে। তাদের দো'আয় নিঃসন্তান সন্তান পেতে ও বেকার চাকুরী পেতে পারে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ ط وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

(হে নবী!) আল্লাহ্ যদি তোমার কোনো অপকার বা ক্ষতি করেন, তবে তিনি ছাড়া তা কেউই দূর করতে পারে না। তিনি যদি তোমার কোনো উপকার করেন, তবে (তাও তিনিই করতে সক্ষম) তিনি সর্বশক্তিমান। (আন'আম ঃ ১৭)

قُلْ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَارَشَدًا- قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِه مُلْتَحَدًا -

(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, তোমাদের লাভ বা লোকসানের ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। আপনি আরও বলে দিন যে, আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারে না— তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছেও আমি কখনো আশ্রয় পাব না।[১] (সূরা জিন ঃ ২১-২২)

আয়াত দু'টি থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হচ্ছে যে, মানুষের উপকার-অপকার বা ভালো-মন্দ কোনো কিছু করার ক্ষমতা কোনো পীরের নেই; কোনো উকিল-মুখতার, রাজা-বাদশা কিংবা কোনো নেতা বা কোনো বিচারকের নেই। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক ঘোষণা করিয়েছেন যে, প্রকৃত ক্ষমতা তারও নেই। প্রকৃত ক্ষমতা এবং অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে। কাজেই বিপদে-আপদে ও দুঃখ-মুসিবতে কেবল তাঁকেই ডাকতে হবে। কেবল তাঁরই কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। অন্য কারো কাছে তা চাইলে তা কালেমারই বিপরীত হবে।

মুসলমানদের মধ্যে আর একটি মারাত্মক ধারণা পাওয়া যায়, তা হলো শাফা'আতের বিকৃত ধারণা। তারা মনে করে, বড় বড় পীর-দরবেশ, ওলী-আল্লাহ্ বা আলেম-মওলানা কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দিবে। মূলত এ ধারণাও একেবারে ভিত্তিহীন— কুরআনী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ -

কেয়ামতের দিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। এ দিন সমস্ত বাদশাহী এবং কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।

১. কেহ কেহ মনে করেন, এ আয়াতটি মনসুখ হয়ে গেছে; কাজেই একে কোনো দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়, চূড়ান্ত নয়। অবশ্য একথা সত্য যে, মনসুখ হওয়ার কথাও কোনো কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। আসল ব্যাপার হলো, এ আয়াতে বলা কথাই হলো রাসূলে করীমের আসল অবস্থা। তিনি সত্যই কিছু জানতেন না, জানতেন শুধু ততটুকু, যতটু আল্লাহ্ তাকে ওহীর মাধ্যমে জানাতেন। ইমাম কুরতুবী ও মাহমুদ আলূসী প্রমুখ বড় বড় মুফাস্‌সির বলেছেনঃ এ আয়াতটি মনসুখ হয়নি।

পীর সাহেবান তো দূরের কথা স্বয়ং বিশ্বনবী, মানবশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করতে বলেছেন ঃ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ -

বলো (হে নবী!) আমি কোনো নতুন নবী নই। আমি নিজেই জানি না যে,(কেয়ামতের দিন) আমার এবং তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হবে। (সূরা আহকাফ ঃ ৯)

এই শাফা'আত[১] বা সুপারিশের ভুল ধারণা প্রচার করে এক শ্রেণীর স্বার্থপর পীর মূর্খ জনগণকে নিজেদের অন্ধ গোলাম বানিয়ে নিয়েছে। তারা লোকদেরকে বুঝিয়েছে যে, পীরকে খুশী করতে পারলে আল্লাহ্ও খুশী হবেন। কিন্তু কুরআনের এ আয়াত এবং কালেমা তাইয়্যেবার পূর্বোল্লিখিত অর্থ জেনে কোনো মুসলমানই আর এই ভুল ধারণা মনের মধ্যে স্থান দিতে পারে না।

বস্তুত এ ধারণা সাধারণ মুসলমানকে ইসলামী কর্ম-কাণ্ড ও ভাবধারা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তারা উক্ত ধারণাকে সত্য ধরে কেবল পীরের হাতে হাত দিয়ে, পীরকে ভেট-বেগার, হাদিয়ে-তোহফা দিয়ে ও কদমবুসি করে খুশি করতে ব্যস্ত হয়েছে প্রাণপণে। ফলে তওহীদের ভাবধারা বিদায় নিয়ে শির্কের অন্ধকার এসে জীবনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এ পর্যায়ে বর্তমানে অতিশয় মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে কবর-পূজার প্রবণতা। যে কোনো ব্যক্তিগত বা জাতীয় কাজের সূচনা কালে কোনো বিশেষ পীর বা 'শহীদ' নামে কথিত ব্যক্তির কবরে হাজিরা দেওয়া হয় সর্বপ্রথম। মনে করা হয়, কবরে শায়িত ব্যক্তি তাকে উত্তীর্ণ করে দেবে কিংবা তার বিপদ দূর করে দেবে। এ সময় এরা আল্লাহ্কে সম্পূর্ণ ভুলে যায় এবং কবরে শায়িত ব্যক্তিকে ভালো-মন্দের মালিক বানিয়ে নেয়। এ যে সুস্পষ্টভাবে শির্ক, তাতে সন্দেহ নেই।

এতদ্ব্যতীত আমাদের মুসলিম সমাজ বর্তমান ইসলাম-বিরোধী নেতৃত্বকে (Leadership) অন্ধভাবে মেনে ও অনুসরণ করে আর এক প্রকারের শির্কের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কালেমা তাইয়্যেবা বুঝে পড়লে ও মন দিয়ে বিশ্বাস করলে বর্তমানের এই নেতৃত্বকে এক মুহূর্তের তরেও বরদাশত করা যায় না। কারণ বর্তমান সময় মুসলিম জাতি বা রাষ্ট্রের ওপর যারা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করছে, তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের মূলমন্ত্র— কালেমাকে—

১. শাফা'আত সম্পর্কিত ধারণা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার, আল্লাহ্র কাছে শুধু দো'আ করা। আর দ্বিতীয় প্রকার, আল্লাহ্র ওপর জোর করে কোনো কথা মানিয়ে নেওয়া। শুধু দো'আ করা এবং সেই দো'আ মঞ্জুর করা বা না-করার এখতিয়ার আল্লাহ্ তা'আলার— শাফা'আতের এ ধারণাকে ইসলাম সমর্থন করে। অন্যটি পরিষ্কার শির্ক।

মনে চলে না; তাদের নিজেদের জীবন নানাবিধ নাফরমানীর বোঝায় একেবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। পরন্তু তারা মুসলমান জনগণকে আল্লাহ্‌র আইন দ্বারা শাসন করে না, ইসলামের সামাজিক ও সাংগঠনিক আদর্শে তাদেরকে সংগঠিত করে না; তাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তাদের নিজস্ব কর্মপন্থা আল্লাহ্‌র বিধানের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন নয়।

পরন্তু তারা যখন মুসলমানদের শাসন ক্ষমতা লাভ করে তখন তারা আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, করে প্রচলিত মানব রচিত আইন অনুযায়ী কিংবা নিজেদের মর্জীমতো। তারা মানুষকে আল্লাহ্‌র দাস না বানিয়ে নিজেদের নিকৃষ্ট দাসে পরিণত করে; আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে তারা প্রবল শক্তিতে বাধা দেয়। আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠিত করার সব চেষ্টা ও সংগ্রামকে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু তবুও মুসলমানগণ সংগঠন ও শাসন-প্রণালী নীরবে সহ্য করে ইসলাম বিরোধী নেতৃত্বকে অন্ধভাবে মেনে চলছে। বর্তমান যুগে এ এক প্রকার মারাত্মক শির্‌ক। এ শির্‌ক মুসলমানদের জীবনকে ইসলামের সীমার বাইরে নিয়ে যেতে খুব বেশি সাহায্য করছে। কিন্তু কালেমা তাইয়্যেবা যারা মানবে ও বিশ্বাস করবে, তাদের প্রতি এ কালেমার আদেশ এই যে, তারা যেন এ ধরনের কোনো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কোনোক্রমেই স্বীকার না করে। অন্যায় নীতি ও পাপ কাজের আদেশ— পীর-বুযর্গ, রাজা-বাদশাহ, নেতা ও মাতব্বর, আলেম-মওলানা— যারই হোক না কেনো, তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যাবে না। এমন কি সব চেয়ে বেশি মান্য করার আদেশ হয়েছে যে পিতা-মাতাকে, তওহীদ স্বীকার করার পর সেই পিতা-মাতারও কোনো অন্যায় আদেশ মানতে হবে না; আল্লাহ্ তা'আলা তা পরিষ্কার ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছেন; এক্ষেত্রে নেতা, পীর বা মাতব্বরদের তো কোনো কথাই উঠতে পারে না। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا -

তোমার পিতা-মাতা যদি আমার (আল্লাহ্‌র) সঙ্গে কোনো শির্‌ক করতে তোমাকে বাধ্য করে— যে সম্পর্কে তোমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই— তবে তাদের আদেশ মোটেই পালন করো না। (সূরা লুকমানঃ ১৫)

শেষ কথা

তওহীদের বিস্তারিত ব্যাখ্যার পর সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত শির্‌কের পরিচয়ও আমরা পাঠকদের খেদমতে পেশ করলাম। আশা করি, এ দুটি বুনিয়াদী বিষয় পাঠকগণ পরিষ্কার করে বুঝতে পেরেছেন।

আমরা মুসলমান; ইসলাম আমাদের ধর্ম— আমাদের জীবন-ব্যবস্থা। সেই ইসলামের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে তওহীদের ওপর। তওহীদ না থাকলে ইসলামের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এ তওহীদের একমাত্র শত্রু হলো শির্‌ক। কাজেই তওহীদকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের বিশেষ সতর্কতার সহিত শির্‌ক থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হাজার মুসলমানী— হাজার ইবাদাত-বন্দেগীর মধ্যে শিরকের একটি বিন্দুও যদি কোনো রকমে প্রবেশ করে, তা হলে বিশ্বাস করুন, আপনার নেক আমলের সব পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে বৃথা যাবে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ج وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا -

আল্লাহ্ কখনো শির্‌ক ক্ষমা করবেন না, অন্য গুনাহ ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করবেন। সুতরাং যে লোক আল্লাহ্‌র সহিত শির্‌ক করে সে অযথাই এক মহাপাপের বোঝা নিজের ওপর টেনে নেয়। (সূরা নিসাঃ ৪৮)

আর শির্‌ক এমন মহাপাপ যা মানুষের সমস্ত নেক আমল নষ্ট করে দেয়। বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

শির্‌ক করলে তাদের যাবতীয় ইবাদাত-বন্দেগীর কাজ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে। (সূরা আন'আম ঃ ৮৮)

এ শির্‌ক কয়েকভাবে মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করতে পারে। আল্লাহ্‌র মূল সত্তা কয়েক অংশে বিভক্ত— এরূপ আকীদা রাখলে শির্‌ক হবে। আল্লাহ্‌র বিশেষ কোনো গুণ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে আছে— এরূপ বিশ্বাস থাকলেও শির্‌ক হবে। মানুষের সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহ্, রক্ষাকারী ও রিযিকদাতাও তিনি ছাড়া আর কেউই নয়। কাজেই সৃষ্টিকর্তা, লালনপালনকারী, রক্ষাকর্তা ও রিযিকদাতা হিসাবে অন্য কাউকেও বিন্দুমাত্র মানলেও শির্‌ক হবে। অনুরূপভাবে প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনায় অন্য কারো একবিন্দু অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করলে এবং সেই বিশ্বাস নিয়ে অপ্রতিবাদী হয়ে সেই আইন মেনে চললেও শির্‌ক হবে। আল্লাহ্‌র আইনকে বাদ দিয়ে অন্যভাবে অন্য কারো রচিত আইন মনের সন্তুষ্টি সহকারে পালন করলেও সুস্পষ্ট শির্‌ক হবে।[১]

১. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব স্বীকার করলে বা বন্দেগী করলেই শির্‌ক হয়, অন্য কারো দেওয়া আইন মানলে শির্‌ক হয় না, এ কথা বিশ্বাস করাও শির্‌ক। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

বস্তুত এ কালেমা একটি পূর্ণাঙ্গ তওহীদী আকীদা দুনিয়ার মানুষের সামনে পেশ করেছে। তাতে আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বতোভাবে এক ও লা-শরীক মেনে নিতে বলা হয়েছে। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা, এ ব্যাপারে অন্য কেউ তাঁর শরীক নেই। একমাত্র তিনিই মানুষের ভয় করার ও ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, এতে অন্য কেউই তাঁর শরীক নেই। তিনিই মানুষের জন্য একমাত্র আইন ও বিধানদাতা— এক্ষেত্রে অন্য কেউই তাঁর শরীক নেই।

এ তওহীদী আকীদার ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা রচনা করেছেন তাঁর মনোনীত দ্বীন-ইসলাম— সমস্ত মানুষের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসাবে। কেবল তাঁর দেওয়া এই জীবন-বিধানকেই গ্রহণ করা যাবে— গ্রহণ করতে হবে। তিনি এতে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনীতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দিয়েছেন; একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি দিয়েছেন। সেই সঙ্গে বিচার কার্যের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইনের ব্যবস্থা করেছেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগুলোকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করাই তওহীদে বিশ্বাসী লোকদের কর্তব্য। আর এ কর্তব্য পালনের সচেষ্ট হলেই মুসলিম হিসাবে দায়িত্ব পালিত হবে। অন্যথায় নামের ও বংশের পরিচয়ে 'মুসলিম' হলেও প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব হবে না।

তাই সব ইবাদত-বন্দেগীর পূর্বে আকীদা-বিশ্বাস সঠিকভাবে পুনর্গঠন করা একান্ত আবশ্যক। প্রথমে মন থেকে সব রকমের শির্কী ধ্যান-ধারণা, মত-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা বিদূরিত করে মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে এবং তারপর তওহীদকে মনের মধ্যে সংস্থাপন করতে হবে। ভালো ফসল পেতে হলে যেমন প্রথমে লাঙ্গল চালিয়ে সমস্ত বন-জঙ্গল দূর করতে হয় এবং জমিকে সম্পূর্ণরূপে জঞ্জাল ও আবর্জনামুক্ত করে তাতে বীজ বপন করতে হয়, মানুষের মস্তিষ্ক ও মনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই করতে হবে। তা হলেই আমাদের তওহীদ-বিশ্বাস আমাদের মন-মগজ ও জীবনকে— জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে— ইসলামের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারব। সেইজন্য প্রথমেই বলতে হয় 'লা-ইলাহা'— কেউই আমার ইলাহ্ নেই;

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْ نَامِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَاؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ -

শির্ককারীরা বলে, আল্লাহ্ চাইলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষ তাঁকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা ইবাদত করতাম না। আর তাঁর হালাল-হারাম বাদ দিয়ে আমরা নিজেরাই কোনো কিছু হারাম করতাম না। (সূরা নহল ঃ ৩৫)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব গ্রহণ ও বন্দেগী করা যেমন শির্ক, আল্লাহ্র হালাল-হারামের আইন বাদ দিয়ে নিজেরাই হালাল-হারামের আইন রচনা করে নেওয়াও ঠিক সেই রকমেরই শির্ক।

আমি কাউকেও 'ইলাহ্' মানি না। তারপর মন থেকে সমস্ত 'ইলাহ্'-এর অস্তিত্ব, নাম-নিশানা, ভয়-ভাবনা, ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং নতি ও আনুগত্য স্বীকারের সকল ভাবধারা চিরতরে দূর করে বলতে হয় ঃ 'ইল্লাল্লাহ'— আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই মা'বুদ নেই; আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমতুল্য কেউ নেই। কিন্তু আমরা সাধারণ মুসলমানরা দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা এই কালেমা মুখে মুখে পড়ছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই আবার এই কালেমা দ্বারা ফাস-আনফাস ও নফী-ইসবাতের 'যিকির' করে কলব ঘষে সাফ করতে ব্যতিব্যস্ত। আর একদল আবার এই কালেমা নিয়ে পথে-ঘাটে বেরে হয়ে যায়, অলিতে-গলিতে ও বাড়িতে-বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় আর যাকে পায়, তাকেই ধরে বলছে ঃ কালেমা পড়। কালেমার অর্থও তারা কিছু না কিছু শুনিয়ে দেয় না এমন নয়। এ সকল শ্রেণীর লোকেরা মনে করে থাকে— মনে মনে কিছুটা অহমিকাও বোধ করে থাকে— যে, তারা ইসলামের মূলমন্ত্র এই কালেমা তাইয়্যেবার প্রচারের 'হক' পূর্ণরূপে আদায় করে ফেলেছে। এর ঘষায় 'কল্‌বের' সব ময়লা দূর হয়ে আয়নার মতো সাফ হয়ে গেছে— এর দ্বারা সাত তবক আসমান ও জমিন পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। অন্যদিকে মনে করা হয় যে, শুধু কালেমা পড়েই আমাদের মুসলমানী কায়েম হয়ে গেছে। বাস্তব কর্মজীবনে, বিশেষত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলাম পালনের কোনো প্রয়োজন নেই বললেই চলে।

বড়ই দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, আমাদের এসব ধারণা ও খেয়াল, কালেমা প্রচারের এ পন্থা এবং কালেমা তাইয়্যেবার এ ব্যবহার আগাগোড়া একেবারেই ভুল। এর কোনোটিই ইসলামী নয়। কুরআন-হাদীস, ইসলামের ইতিহাস, রাসূলুল্লাহ্‌র কর্মপন্থা এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্ম-পদ্ধতি যারা জানেন, তাদের কাছে আমার এ কথা কিছুমাত্র নতুন ঠেকবে না। কেননা, প্রকৃতপক্ষে কালেমা তাইয়্যেবা প্রথমতো একটি বিপ্লবী আকীদা ও বিশ্বাস, চিন্তা ও মতবাদ মাত্র। দ্বিতীয় স্তরে এটি বাস্তব কর্ম জীবনের আদর্শ ও চরিত্র গঠনের মৌলিক মানদণ্ড। তৃতীয় স্তরে এই কালেমা আন্দোলনের মূল দাওয়াত এবং জন-সংগঠন ও সমাজ-সংশোধনের হাতিয়ার। আর চতুর্থ স্তরে এই কালেমা একটি বিপ্লব, একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজের ভিত্তি, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সরকারী নীতি নির্ধারণের মূলনীতি, ভিন্নতর জাতি ও রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের স্থায়ী মাপকাঠি। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনাদর্শ ও কর্মধারা থেকে এ কথার সত্যতা অনস্বীকার্যরূপে প্রমাণিত হয়। তাই কালেমার এ মর্যাদা ও ধারণাকে যথার্থরূপে বজায় রাখা ও এরূপ ক্রমিক ধারার ভিত্তিতে একে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং সেই জন্য চেষ্টা করাই কালেমা বিশ্বাসী লোকদের কর্তব্য। মোটামুটি এ কালেমার প্রচার এবং ব্যবহার ঠিক

তেমনিভাবে করতে হবে, যেমন করে দেখিয়ে দিয়েছেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)। এ প্রসঙ্গে আর একটি দরকারী কথা না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ব্যক্তি হিসাবে একজন মুসলমান হওয়ার জন্য যেমন কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা দরকার, একটি জনসমষ্টির মুসলমান হওয়ার জন্যও ঠিক তেমনিভাবে কালেমা পড়তে হয়। আমরা দুনিয়ার মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে সকলেই কালেমা পড়েছি; জাতি হিসাবেও আমাদেরকে কালেমা পড়তে হবে একে রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে ঘোষণা করার মাধ্যমে। আমাদের সংবিধান ও যাবতীয় আইন-কানুনও এই কালেমা অনুযায়ী রচনা করতে এবং সেই অনুযায়ী কার্যত রাষ্ট্রকে চালাতে হবে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আমরা অমুক দেশের জনগণ এক আল্লাহ্‌কে সারা জাহানের মালিক ও প্রভু বলে স্বীকার করি এবং তাঁর আমানত এ রাষ্ট্রকে তাঁরই বিধানমতো আমরা চালাব। আবার কোনো কোনো দেশের সংবিধানে লেখা হয়েছেঃ "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।" সেই সাথে ব্যাখ্যা স্বরূপ লেখা হয়েছে ঃ এ নীতিসমূহ দেশ পরিচালনার মূল সূত্র হবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তা প্রয়োগ করবে। ...... অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে তা নির্দেশক হবে এবং তা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কাজের ভিত্তি হবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেউ শুধু কালেমা পড়েই যেমন 'মুসলমান' হতে পারে না, জাতিগতভাবেও কোনো দেশবাসী শুধু এ প্রস্তাবনা বা লেখা দলীল দ্বারাই পূর্ণ মুসলমান হতে পারে না এবং তাদের রাষ্ট্রও খালেস ইসলামী হুকুমত হতে পারে না। এ কারণে সংবিধানের ওইসব ঘোষণা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে গেছে। সেই জন্য একান্ত প্রয়োজন কার্যত এ ঘোষণাকে মান্য করা ও তদনুসারে সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেওয়া আর সে লক্ষ্যে এমন লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, যারা কালেমার প্রতি সচেতন ঈমানদার, বাস্তবে তা পালন করে চলে এবং সেই অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাবার যোগ্যতা রাখে। তাই আজ একদিকে মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনকে যেমন কালেমা অনুযায়ী পূর্ণ ইসলামী বানাতে চেষ্টা করা কর্তব্য, ঠিক তেমনি তাদের জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি বিভাগকে বাস্তবভাবে পূর্ণ ইসলামী আদর্শে ঢেলে-ই গঠন করাও একান্ত আবশ্যক। দুনিয়ার মুসলমানদের আজ এ-ই একমাত্র কাজ। এই কাজে যিনি বেশি চেষ্টা করবেন, তার কালেমা পড়া দুনিয়া ও আখেরাতে ততই সার্থক ও ফলদায়ক হবে, সন্দেহ নেই।

অতএব, আসুন, তওহীদের এ বিপ্লবী কালেমা নিয়ে আবার আমরা পৃথিবীর বুকে মাথা জাগিয়ে উঠি। নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে এ কালেমার আদর্শে ঢেলে গঠন করি, সমাজ

থেকে যাবতীয় শির্‌ক, বিদয়াত এবং সর্ব প্রকার পাপপ্রথা ও অব্যবস্থাকে সকলে মিলে চূর্ণ করে দিয়ে বিশ্বনবীর প্রচারিত 'তওহীদী দ্বীন'কে প্রথমে নিজ নিজ দেশে এবং তারপর সমগ্র দুনিয়ার বুকে আবার জয়যুক্ত করে তুলি; সেই অনুযায়ী সংবিধান, আইন-কানুন, শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলি। এজন্য এক সংঘবদ্ধ গণমুখী সংগ্রাম চালাতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষকে এ কালেমার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে; গঠন করতে হবে প্রত্যেকটি পরিবার, সমাজ ও জনসমষ্টিকে। এ সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়াই মুসলমানদের সারা জীবনের কাজ। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব। এ দায়িত্বের কথা সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায়ই মনের মধ্যে জাগরুক রাখতে হবে— মুহূর্তের তরেও একথা ভুলে যাওয়া চলবে না। অন্যথায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হতে হবে। এ পুস্তকখানি সকলকে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

সারকথা

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'— কালেমার এ অংশের অর্থ জেনে একে মানলে নিম্নের কাজগুলো করা অবশ্য কর্তব্য হয় ঃ

১. আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও সাহায্যকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ও মুক্তিদাতা বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করব না।

২. আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ক্ষতি-উপকার করতে পারে বলে মনে করতে পারব না, সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করব।

৩. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে দো'আ করতে এবং সাহায্যের প্রার্থনা করতে পারব না।

৪. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত বা বন্দেগী করব না এবং কারো নামে মানত করব না।

৫. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও প্রভু, আইনদাতা ও বিধানদাতা এবং বাদশাহ বা সার্বভৌম বলে স্বীকার করব না— অন্য কারো আইন মানব না (এমন আইন মানব না যা মূলত আল্লাহ্‌র আইনের ভিত্তিতে ও এর সীমার মধ্যে রচিত হয় নাই)।

৬. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো বান্দাহ্ বা দাস হয়ে থাকব না এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনা ও দেশ-চলতি প্রথাসমূহ অন্ধভাবে অনুসরণ করব না।

৭. জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধানকে একমাত্র ভিত্তি বলে মানব ও সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ আঞ্জাম দেবো।

৮. জীবনের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি কেবল আল্লাহ্‌র কাছে করতে হবে—এ বিশ্বাস হৃদয়-মনে সদা জাগ্রত রাখব, এবং যে-কাজে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন সেই কাজ করতে ও যে-কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা থেকে বিরত থাকতে সর্বদা চেষ্টা করব।

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'— কালেমার এই শেষ অংশ উচ্চারণ এবং স্বীকার করলে মানতে হবে ঃ

১. হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

২. তাঁর মাধ্যমে যে জীবন-বিধান ও হেদায়েত আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসেছে তা-ই সত্য এবং শাশ্বত।

৩. তাঁর উপস্থাপিত আদর্শ ও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার বিরোধী যা তা সবই ভুল ও ভ্রষ্টতা এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য।

৪. তিনি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিই মানুষের 'স্বাধীন নেতা' হতে পারে না। তিনিই কালেমা বিশ্বাসীদের একমাত্র চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ নেতা।

৫. অতএব মানব জীবনের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের হাদীস তথা সুন্নাহ্ অনুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬. এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালাতে হবে যা এই কালেমা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং আইন-বিধান রচনার মৌলিক অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই স্বীকৃত ও ঘোষিত।

প্রত্যেকটি মুসলমানের এ-ই মূল বিশ্বাস। প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য এই কর্ম-বিধান।

পাঠকের প্রতি

'কালেমা তাইয়্যেবা' আপনি অনবরত পড়িয়া থাকেন। এই বইখানির মাধ্যমে উহার বিস্তারিত অর্থ ও ব্যাখ্যা আপনি জানিতে পারিলেন। ইহাতে আপনার উপর কঠিন দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।

এক্ষণে আপনাকে প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে, কালেমার এই ব্যাখ্যাসহ ইহার প্রতি আপনি পূর্ণ ও খালেস ঈমান আনিতে পারিতেছেন কিনা। যদি না পারেন তাহা হইলে ইহার প্রতি খালেস ঈমান আনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। আপনার চিন্তা, বিশ্বাস ও মূল্যমান এই অনুযায়ী ঢালিয়া গঠন করুন।

দ্বিতীয় ঃ এই কালেমার বিস্তারিত ব্যাখ্যার আলোকে আপনি আপনার নিজের কর্মজীবন যাচাই করুন। তাহাতে ইহার বিপরীত কিছু দেখিতে পাইলে তাহা দূর করুন। নিজেকে কালেমা অনুযায়ী পুরাপুরি সংশোধন করিয়া লউন।

তৃতীয় ঃ আপনার গোটা পরিবার ও ঘর-সংসারে এই কালেমার বিপরীত কিছু থাকিলে তাহা সংশোধন করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

চতুর্থ ঃ আপনার পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক লেন-দেন, বিচার-আচার সব কিছুই এই কালেমার মানদণ্ডে যাচাই করুন এবং সব কিছুকে এই কালেমা অনুযায়ী গড়িয়া তোলার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করুন। সে চেষ্টা আপনি একা করিতে পারিবেন না, দলবদ্ধভাবে তাহা করিতে হইবে। অতএব এই চিন্তার লোক জোগাড় করুন এবং ঐক্যবদ্ধ হইয়া কালেমা'কে সমগ্র জীবনের উপর বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করিয়া দিন।

আমার সারা জীবনের ইহাই একমাত্র দাওয়াত সমস্ত মানুষের প্রতি।

(মওলানা) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়্যেবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামের অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'খেলাফতে রাশেদা', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)', 'আল্লাহর হক বান্দার হক' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ.)-এর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও ইসলামে হালাল হারামের বিধান', 'মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাসের ঐতিহাসিক তাফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও ঊর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচীত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁর রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব' এবং 'ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থ দু'টি সুধীজন কর্তৃক প্রসংশিত এবং বহুল পঠিত।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগস্রষ্টা মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)